

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কর্তৃক ২০১২ শিক্ষাবর্ষ থেকে  
সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকরূপে নির্ধারিত

---

# সপ্তবর্ণা

সপ্তম শ্রেণি

সংকলন, রচনা ও সম্পাদনা

অধ্যাপক ড. মাহবুবুল হক  
অধ্যাপক নিরঞ্জন অধিকারী  
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ ঘোষ  
অধ্যাপক ড. রফিকউদ্দাহ খান  
অধ্যাপক ড. সৈয়দ আজিজুল হক  
অধ্যাপক শ্যামলী আকবর  
অধ্যাপক ড. সৌমিত্র শেখর  
ড. সরকার আবদুল মান্নান  
ড. পোয়াইব জিবরান  
শাহীম জাহান আহসান

---

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

# জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

৬৯-৭০ মতিঝিল বানিজ্যিক এলাকা, ঢাকা  
কর্তৃক প্রকাশিত।

[ প্রকাশক কর্তৃক সর্বস্বত্ত্ব সংরক্ষিত ]

প্রথম প্রকাশ : সেপ্টেম্বর, ২০১১

১ম পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৪

২য় পরিমার্জিত সংস্করণ : সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রচ্ছদ ও চিত্রাঙ্কন

সুদর্শন বাছার

সুজাউল আবেদীন

ডিজাইন

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড

কম্পিউটার কম্পোজ

কালার গ্রাফিক

সরকার কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণের জন্য

## প্রসঙ্গ-কথা

শিক্ষা জাতীয় উন্নয়নের পূর্বশর্ত। আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা ছাড়া আত্মনির্ভরশীল, দক্ষ ও মর্যাদাসম্পন্ন জাতি-পঠন সম্ভব নয়। এই প্রত্যয় ও প্রণোদনা থেকেই জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০১০ প্রণীত হয়। উক্ত শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে নতুন এক জীবনকাক্সিকা ও জীবন-বাস্তবতার পটভূমিতে রচিত হয় নিম্নমাধ্যমিক ও মাধ্যমিক স্তরের নতুন শিক্ষাক্রম। ২০১১ সালে প্রণীত এই শিক্ষাক্রমের উদ্দেশ্যকে মধ্যযথ্যভাবে সত্তম শ্রেণির সত্ত্বর্ষা শীর্ষক পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিফলিত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে পাঠ্যপুস্তকটিতে প্রতিটি গল্প, কবিতা ও প্রবন্ধ এমনভাবে নির্বাচন করা হয়েছে যাতে শিক্ষার্থীরা এসেদের ইতিহাস-ঐতিহ্য, শিল্প-সংস্কৃতি, নীতি-মূল্যবোধ ও মূল্যবোধ সম্পর্কে ধারণা লাভ করে এবং এই জনসোষ্ঠীর জীবনযাপন, মুক্তিযুদ্ধের মহান অর্জন, দেশস্নেহ, মানবতাবোধ, প্রকৃতি-চেতনা, নারী-পুরুষের সমমর্যাদা, শ্রাক্তবোধ ও বিজ্ঞান-চেতনা প্রকৃতি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় নিয়ে ভাবার সুযোগ পায়। সুস্থ চিন্তার চর্চা ও পরিচ্ছন্ন জীবনবোধ সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অগ্রহী করে তোলাই এই আরোজনের অন্যতম উদ্দেশ্য। ফলে অনিবার্যভাবেই সকলিত রচনাগুলোর মধ্যে কিছু কিছু রচনা সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত হয়েছে। এছাড়া জাতীয় প্রত্যাশা অনুযায়ী প্রচুর পাঠের ভার থেকে শিক্ষার্থীদের মুক্ত করে স্বল্প ও সুন্দর আরোজনের মধ্যে তাদের আনন্দিত বিচরণ নিশ্চিত করার চেষ্টা করা হয়েছে।

নতুন শিক্ষাক্রম অনুসারে মূল্যায়নকে আরও ফলপ্রসূ করার জন্য দেশের সুশীলজন ও শিক্ষাবিদগণের পরামর্শের আলোকে সরকারি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিটি অধ্যায়শেষে অনুশীলনের জন্য নমুনা হিসেবে বহুবিধাচনী ও সৃজনশীল প্রশ্ন সংযোজন করা হয়েছে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মুখস্থনির্ভরতা বহুলাংশে হ্রাস পাবে এবং তারা অর্জিত জ্ঞান ও অনুধাবন বাস্তবজীবনে প্রয়োগ করতে এবং যেকোনো বিষয়কে বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করতে পারবে। এছাড়া প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে জীবনমুখী কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার জন্য বিভিন্ন কাজের আরোজন রাখা হয়েছে। কর্ম-অনুশীলন শীর্ষক অংশে শিক্ষার্থীরা ব্যক্তিগত দক্ষতা, সৃজনশীলতা, স্মৃতি ও সৌন্দর্যবোধের পরিচয় নিতে পারবে। বানানের ক্ষেত্রে সর্বত্র অনুসৃত হয়েছে বাংলা একাডেমির বানাননীতি।

শিক্ষাক্রম উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এবং এর ভিত্তিতে পাঠ্যপুস্তক রচিত হয়। ২০১৫ শিক্ষাবর্ষের পাঠ্যপুস্তকটি বৌতিক মূল্যায়ন ও ট্রাই-আউটের মাধ্যমে পরিমার্জিত হলেও তখন সময়সম্পত্তার কারণে বিষয়বস্ত্তসমূহে কোনো পরিবর্তন আনা হয়নি। এবারের সংস্করণে সুপারিশ অনুযায়ী বেশ কিছু বিষয়বস্ত্ত পরিবর্তন ও পরিমার্জন করা হয়েছে। আশা করি বর্তমান শিক্ষাক্রমের আলোকে নতুন বিষয়বস্ত্তসমূহ শিক্ষার্থীদের বৌতিক শিখন-গাইদা পূর্ণে সহায়ক হবে।

পাঠ্যপুস্তকটি রচনা, সম্পাদনা, সৃজনশীল প্রশ্ন ও কর্ম-অনুশীলন প্রণয়ন, পরিমার্জন এবং প্রকাশনার কাজে যারা আন্তরিকভাবে মেধা ও প্রম দিয়েছেন, তাঁদের জানাই ধন্যবাদ। পাঠ্যপুস্তকটি শিক্ষার্থীদের আনন্দিত পাঠ ও প্রত্যাশিত দক্ষতা অর্জন নিশ্চিত করবে বলে আশা করি।

প্রফেসর নারায়ণ চন্দ্র সাহা

চেয়ারম্যান

জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, বাংলাদেশ

## সূচিপত্র

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
<b>গদ্য</b>		
১. কাবুলিওয়ালা	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	১
২. লখার একুশে	- আবুবকর সিদ্দিক	৮
৩. মরু-ভাঙ্কর	- হাবীরাহু বাহার	১৩
৪. শব্দ থেকে কবিতা	- হুমায়ুন আজাদ	১৮
৫. পাখি	- লীলা মজুমদার	২৩
৬. পিতৃপুরুষের গল্প	- হালুন হাবীব	৩০
৭. ছবির রং	- হাশেম খান	৩৬
৮. রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন	- সেলিনা হোসেন	৪১
৯. সেই ছেদেটি	- মামুনুর রশীদ	৪৬
১০. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	- এ. কে. শেরাম	৫২

## কবিতা

১. নতুন দেশ	- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	৫৮
২. কুশি-মজুর	- কাজী নজরুল ইসলাম	৬২
৩. আমার বাড়ি	- জসীম উদ্দীন	৬৬
৪. শোন একটি মুজিবরের থেকে	- গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার	৭০
৫. সবার আমি ছাত্র	- সুনির্মল বসু	৭৪
৬. শ্রাবণে	- সুকুমার রায়	৭৮
৭. গরবিনী মা-জননী	- সিকান্দার আবু জাফর	৮১
৮. সম্য	- সুফিয়া কামাল	৮৬
৯. মেলা	- আহসান হাবীব	৮৯
১০. এই অক্ষরে	- মহাদেব সাহা	৯৩

# কাবুলিওয়ানা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর



আমার পাঁচ বছর বয়সের ছোট মেয়ে যিনি এক দণ্ড কথা না কহিয়া থাকিতে পারে না।

সকালবেলায় আমার নভেলের সঙলশ পরিচ্ছেদে হাত দিয়াছি এমন সময় যিনি আসিয়াই আরম্ভ করিয়া দিল, “বাবা, রামদহাল দরওয়ান কাককে কোঁরা বলছিল, সে কিচ্ছু জানে না। না ?”

সে আমার লিখিবার টেবিলের পার্শ্বে আমার পায়ের কাছে বসিয়া নিজের দুই হাঁটু এবং হাত লইয়া অদ্ভুত উচ্চারণে আপড়ুম-বাগড়ুম খেলিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

আমার ঘর পথের ধারে। হঠাৎ যিনি আপড়ুম-বাগড়ুম খেলা রাখিয়া জানালার ধারে ছুটিয়া গেল এবং ডিম্কার করিয়া ডাকিতে লাগিল, “কাবুলিওয়ানা, ও কাবুলিওয়ানা।”

ফর্ম-১, ৭ম শ্রেণি (সঙলশ)

ময়লা ঢিলা কাপড় পরা, পাগড়ি মাথার, তুলি খাড়ে, হাতে গোটা দুই-চার আঙুরের বাজ, এক লখা কাবুলিওয়াল পথ দিয়ে বাইতেছিল— তাহাকে দেখিয়া আমার কন্যারেল্লের কিরূপ ভাবোদয় হইল বলা শক্ত, তাহাকে উর্ফ্বাসে ডাকাডাকি আরম্ভ করিয়া দিল।

মিনির চিব্বাকারে যেমনি কাবুলিওয়াল হাসিয়া মুখ ফিরাইল এবং আমাদের বাড়ির দিকে আসিতে লাগিল, অমনি সে উর্ফ্বাসে অভয়পুরে দৌড় দিল, তাহার আর চিহ্ন সেখিতে পাওয়া গেল না। তাহার মনের মধ্যে একটা অন্ধ বিশ্বাসের মতো ছিল যে, ঐ তুলিটার ভিতর সন্ধান করিলে তাহার মতো দুটো-চারটে জীবিত মানবসন্ধান পাওয়া হইতে পারে।

আমি মিনির অমূলক ভয় ভাঙাইয়া দিবার অভিপ্রায়ে তাহাকে অভয়পুর হইতে ডাকাইয়া আনিলাম— সে আমার পা বেঁধিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কাবুলি তুলির মধ্য হইতে কিসমিস খোবানি বাহির করিয়া তাহাকে দিতে গেল, সে কিছুতেই লইল না, বিগুণ সন্দেহের সহিত আমার হাঁটুর কাছে সংলগ্ন হইয়া রহিল। প্রথম পরিচয়টা এমনি ভাবে গেল।

কিছুদিন পরে একদিন সকালবেলায় বাড়ি হইতে বাহির হইবার সময় দেখি, আমার দুহিটাটি ঘরের সমীপস্থ বেঞ্চির উপর বসিয়া অনলগ্ন কথা কহিয়া হইতেছে এবং কাবুলিওয়াল তাহার পদতলে বসিয়া সহস্যমুখে তনিতেছে এবং মধ্যে মধ্যে প্রসঙ্গক্রমে নিজের মতামতও ব্যক্ত করিতেছে। মিনির পক্ষবীয় জীবনের অভিজ্ঞতায় বাবা ছাড়া এমন ধৈর্যবান প্রোতা সে কখনো পায় নাই। আবার দেখি, তাহার ক্ষুদ্র অঁচল বাদাম-কিসমিসে পরিপূর্ণ।

সংবাদ পাইলাম, কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির এই বে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ তাহা নহে, ইতিমধ্যে সে প্রায় প্রত্যহ আসিয়া পেছাবাদাম খুশ দিয়া মিনির ক্ষুদ্র হৃদয়টুকু অনেকটা অধিকার করিয়া লইয়াছে।

দেখিলাম, এই দুটি বছর মধ্যে গুটিকতক বাঁধা কথা এবং ঠাট্টা প্রচলিত আছে — যথা, রহমতকে দেখিবামাত্র আমার কন্যা হাসিতে হাসিতে জিজ্ঞাসা করিত, “কাবুলিওয়াল, ও কাবুলিওয়াল, তোমার ও তুলির ভিতর কী।”

রহমত একটা অনাবশ্যক চন্দ্রবিন্দু খোপ করিয়া হাসিতে হাসিতে উত্তর করিত, “হাঁতী।”

উহাদের মধ্যে আরো—একটা কথা প্রচলিত ছিল। রহমত মনিকে বলিত, “যৌষী, তোমি সসুরবাড়ি কত্থু যাবে না!”

কথাটার একটা কোনো জবাব না দিয়া হুপ করিয়া থাকা নিতান্ত তাহার স্বভাববিরুদ্ধ — সে উলটিয়া জিজ্ঞাসা করিত, “তুমি স্বত্তরবাড়ি যাবে?”

রহমত কাল্পনিক স্বত্তরের প্রতি প্রকাণ্ড মোটা মুষ্টি আঁকলন করিয়া বলিত, “হামি সসুরকে মারবে।”

তন্নিয়া মিনি স্বত্তর-নামক কোনো—এক অপরিচিত জীবের দুরবস্থা কল্পনা করিয়া অত্যন্ত হাসিত।

মিনির হা অত্যন্ত শক্তিত স্বভাবের সোক। রহমত কাবুলিওয়াল সখাছে তিনি সম্পূর্ণ নিঃসংশয় ছিলেন না। তাহার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাবিবার জন্য তিনি আমাকে বারবার অনুরোধ করিয়াছিলেন।

একদিন সকালে আমার ছোট ঘরে বসিয়া প্রুফপিটি সংশোধন করিতেছি। এমন সময় রাত্তার তাহি একটা গোল তন্না গেল।

চাহিয়া দেখি, আমাদের রহমতকে দুই পাহারাওয়াল বঁধিয়া লইয়া আসিতেছে— তাহার পশ্চাতে কৌতুহলী ছেলের দল চলিয়াছে। আমি ঘরের বাহিরে গিয়া পাহারাওয়ালকে দাঁড় করাইলাম, জিজ্ঞাসা করিলাম, ব্যাপারটা কী।

কিয়দংশ তাহার কাছে, কিয়দংশ রহমতের কাছে তনিয়া জাশিয়া যে, আমাদের প্রতিবেশী একজন লোক রামপুরী চাদরের জন্য রহমতের কাছে কিঞ্চিৎ খারিজ— মিথ্যাপূর্বক সেই সেনা সে অস্বীকার করে এবং ডাড়াই লইয়া বচসা করিতে করিতে রহমত তাহাকে এক ছুরি বসাইয়া দিয়াছে।

রহমত সেই মিথ্যাবাদীর উদ্দেশে নানারূপ অজ্ঞান্য গালি দিতেছে, এমন সময় 'কাবুলিওয়ালা, ও কাবুলিওয়ালা' করিয়া ডাকিতে ডাকিতে মিনি ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল।

রহমতের মুখ মুহূর্তের মধ্যে কৌতুকহাস্যে প্রকৃত হইয়া উঠিল। মিনি একেবারেই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি স্বতঃবাঞ্ছিত যাবে?"

রহমত হাসিয়া কহিল, "সিখানেই যাচ্ছে।"

সাংঘাতিক আঘাত করা অপরাধে কয়েক বৎসর রহমতের কারাদণ্ড হইল।

তাহার কথা একপ্রকার ভুলিয়া পেলাম।

কত বৎসর কাটিয়া গেল। আমার ঘরে আজ রাত্রি শেষ হইতে না হইতে সানাই বাজিতেছে। আজ আমার মিনির বিবাহ।

আমি আমার শিবিবার ঘরে বসিয়া হিসাব দেখিতেছি, এমন সময় রহমত আসিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইল।

আমি প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারিলাম না। তাহার সে হুলি নাই, তাহার সে লথা চুল নাই, তাহার শরীরে পূর্বের মতো সে তেজ নাই। অবশেষে তাহার হাসি দেখিয়া তাহাকে চিনিলাম।

কহিলাম, "কী রে রহমত, কবে আসি।"

সে কহিল, "কাল সন্ধ্যাবেলা জেল হইতে খালাস পাইয়াছি।"

আমার ইচ্ছা করিতে লাগিল, আজিকার এই ভতমিনে এ লোকটা এখান হইতে গেলেই ভালো হয়।

আমি তাহাকে কহিলাম, "আজ আমাদের বাড়িতে একটা কাজ আছে, আমি কিছু ব্যস্ত আছি, তুমি আজ যাও।"

কথাটা তনিয়াই সে ভৎসনাং চলিয়া যাইতে উদ্যত হইল, অবশেষে দরজার কাছে গিয়া একটু ইতস্তত করিয়া কহিল, "খোঁষীকে একবার দেখিতে পাইব না?"

আমি কহিলাম, "আজ বাড়িতে কাজ আছে, আজ আর কাহারও সহিত দেখা হইতে পারিবে না।"

সে যেন কিছু ক্ষুব্ধ হইল। শুদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া একবার হিরদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চাহিল, তার পরে 'বাবু সেলাম' বলিয়া দ্বারের বাহির হইয়া গেল।

আমার মনে কেমন একটু ব্যথা বোধ হইল। মনে করিতেছি তাহাকে কিরিয়া ডাকিব, এমন সময়ে দেখি সে আপনি কিরিয়া আসিতেছে।

কাছে আসিয়া কহিল, "এই আতুর এবং কিঞ্চিৎ কিসমিস বাদাম খোঁষীর জন্য অনিয়াছিলাম, তাহাকে দিবেন।"

আমি সেগুলি লইয়া দাম দিতে উদ্যত হইলে সে হঠাৎ আমার হাত চাপিয়া ধরিল, কহিল, "আপনার বহুৎ দয়া, আমার চিরকাল স্মরণ থাকিবে— আমাকে পরস্য দিবেন না। বাবু, তোমার যেমন একটু লজ্জা আছে, তেমনি দেশে আমারও



একটি লড়কী আছে। আমি তাহারই খুশখানি স্মরণ করিয়া তোমার খোঁবার জন্য কিছু কিছু মেওয়া হাতে লইয়া আসি, আমি তো সত্তা করিতে আসি না।”

এই বলিয়া সে আপনার মস্ত ঢিলা জামাটার ভিতর হাত ঢালাইয়া দিয়া বকের কাছে কোথা হইতে এক টুকরা ময়লা কাগজ বাহির করিল। বহু সবয়ে ভাঁজ পুটিয়া দুই হাতে আমার টেবিলের উপর মেসিয়া ধরিল।

সেবিলাম, কাগজের উপর একটি ছোট হাতের ছাপ। ফটোখাক নহে, তেলের ছবি নহে, হাতে খানিকটা ভূষা মাখাইয়া কাগজের উপরে তাহার চিহ্ন ধরিয়া লইয়াছে। কন্যার এই স্মরণচিহ্নটুকু বকের কাছে লইয়া রহমত প্রতিবন্দর কলিকাতার রাস্তার মেওয়া বেচিতে আসে।

সেবিয়া আমার চোখ জ্বলজ্বল করিয়া আসিল। সেই হস্তচিহ্ন আমারই মনিকে স্মরণ করাইয়া দিল। আমি তৎক্ষণাৎ তাহাকে অভ্যুপরি হইতে ডাকাইয়া পাঠাইলাম। অভ্যুপরে ইহাতে অনেক আগন্তি উঠিয়াছিল। কিন্তু আমি কিছুতে কর্ণপাত করিলাম না। রাজাচেলি-পরা কপালে-চন্দন-আঁকা বখুবেনী মিনি সলজ্জভাবে আমার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল।

তাহাকে দেখিয়া কাবুলিওয়াল প্রথমটা ধতমত বাইয়া গেল, তাহাদের পুরাতন আলাপ জমাইতে পারিল না। অবশেষে হাসিয়া কহিল, “খোঁখী, তোমি সসুৰবাড়ি যাবিস?”

কাবুলিওয়ালার সহিত মিনির যেদিন প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল, আমার সেই দিনের কথা মনে পড়িল। মনটা কেমন ব্যথিত হইয়া উঠিল।

মিনি চলিয়া গেলে একটা গভীর শীর্ণনিশ্বাস ফেলিয়া রহমত মাটিতে বসিয়া পড়িল। সে হঠাৎ স্পষ্ট বুঝিতে পারিল, তাহার মেয়েটিও ইতিমধ্যে এইরূপ বড় হইয়াছে।

আমি একখানি নোট লইয়া তাহাকে দিলাম। সেবিলাম, “রহমত, তুমি দেশে তোমার মেয়ের কাছে কিরিয়া যাও; তোমাদের মিলনদুখে আমার মিনির কল্যাণ হউক।”

(সংক্ষেপিত)



## শব্দার্থ ও টীকা

---

কাবুল	—	আফগানিস্তানের রাজধানী।
কাবুলিওয়াল	—	কাবুলের অধিবাসী। অতীতে কাবুলের অনেক লোক নানা কাজ নিয়ে এ দেশে নিয়মিত যাতায়াত করত।
দস্ত	—	মুহূর্ত।
নভেল	—	উপন্যাস।
সত্তদশ	—	সতের।
পরিচ্ছেদ	—	অধ্যায়।
পার্শ্ব	—	পাশে।
কন্যারত্ন	—	কন্যাকে আদর করে রত্নের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।
ভাবোদয়	—	ভাবের উদয়। মনে চিন্তা বা ভাবনা জাগা।
উর্ধ্ব্বাসে	—	অতি স্নেহবশে।
অন্তঃপুর	—	বাড়ির ভেতরের অংশ।
অভিষ্য	—	ইচ্ছা।
খোবানি	—	বাদাম জাতীয় ফল।
দুহিতা	—	কন্যা।
দার	—	দরজা।
সমীপস্থ	—	নিকটে, কাছে।
অনর্গল	—	অবিরাম, অনবরত।
সহাস্যমুখ	—	হাসি মুখ।
পঞ্চবর্ষীয়	—	পাঁচ বছর বয়সী।
খোবী	—	কাবুলিওয়াল কর্তৃক 'খুতি' শব্দের অশুভ উচ্চারণ।
সত্যবিক্রম	—	সত্যের বিপরীত।
মুষ্টি আকালন	—	জোরে মুষ্টি নাড়ানো।
নিয়মশেষ	—	শঙ্কাহীন।
কিঞ্চিৎ	—	অল্প।
ধারিত	—	কণ্ঠস্থ।
প্রসুত	—	আনন্দিত।
লঙ্কী	—	মেয়ে।

## পাঠের উদ্দেশ্য

---

বাংলা ভাষার সাধু রীতির সাহিত্য পাঠে অনুপ্রাণিত করা।

## পাঠ-পরিচিতি

ভিন্ন সংস্কৃতিতে বেড়ে উঠলেও মানুষের সুখ-দুঃখ, আনন্দ ভালবাসার অনুভূতি অনেকাংশেই এক। ‘কাবুলিওয়াদা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আফগানিস্তানের মরু পর্বতের রুক্ষ প্রকৃতিতে গড়ে ওঠা একজন পিতা এবং নাতিশীতোষ্ণ আবহাওয়ার একজন বাঙালি পিতার তেতরের শ্রেহবণ মনের ঐক্য সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন। দেশকালের সীমারেখা পিতৃহৃদয়ের স্বাভাবিক প্রবণতায় কোনো প্রভাব বিস্তার করে না। যে দেশের বা যে সময়ের বা যে সংস্কৃতিরই মানুষ হোক না কেন পিতা সব সময়ই তার সন্তানকে একই রকমভাবে ভালবাসেন। সন্তানের মঙ্গল-চিন্তা সব পিতারই সহজাত আকাঙ্ক্ষা। ‘কাবুলিওয়াদা’ গল্পে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বিশ্বের সকল পিতার পিতৃহৃদের সার্বজনীন ও চিরন্তন রূপকে উন্মোচিত করেছেন।

## লেখক-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসভায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মে (২৫এ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। স্কুলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সত্যেরো বছর বয়সে বিশেষে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু ‘শিক্ষা ও সাধনার’ একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত—সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আত্মর্ষ অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ এবং চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অন্যান্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক এবং অভিনেতা। ধ্রুপদীকেনন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষার নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কিশোরক’ নামে একটি সংকলনে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. সাধু রীতিতে লেখা ১০টি গল্পের তালিকা তৈরি কর। (একক কাজ)
- খ. পাঠ্য বইয়ের ১টি করে সাধু ও চলিতরীতির গদ্য অবলম্বনে রীতি দুটোর ৫টি পার্থক্য বের কর। (দলীয় কাজ)।
- গ. সাধু রীতির একটি অনুচ্ছেদ চলিত রীতিতে রূপান্তর কর।

## দমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ‘কাবুলিওয়াদা’ গল্পে সজ্জিত স্বভাবের মানুষটি কে ?

ক. রহমত	খ. মিনির মা
গ. রামদয়াল	ঘ. মিনির বাবা

২. মিনির বাবার মনে একটু ব্যথা বোধ হয়েছিল কেন ?

- ক. মিনির স্বপ্নর বাড়ি যাচ্ছে বলে  
খ. রহমতকে কারাগারে যেতে দেখে  
গ. মিনির সাথে রহমতের দেখা না হওয়ায়  
ঘ. রহমতের মেয়ের কথা ভেবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

ফাতেমা চৌধুরী অফিসে যাওয়ার পথে প্রায়ই একটি পথনিচকে রাস্তার তীরে থাকতে দেখেন। একদিন তিনি হেলোটিকে কিছু খাবার দিতে চাইলে সে ভয়ে পালিয়ে যায়। কয়েকদিনের চেষ্টায় হেলোটি তার সাথে নানা গল্পে মেতে উঠে। এখন প্রায়মিনই তিনি হেলোটির জন্য বাসায় তৈরি খাবার নিয়ে আসেন। তবে কখনো তার দেখা না পেলে খুব চিন্তিত হয়ে ওঠেন।

৩. উদ্দীপকের ফাতেমা চৌধুরীর সাথে ‘কাবুলিওয়াদা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে ?

- ক. রহমত  
খ. রামদয়াল  
গ. লেখক  
ঘ. মিনি

৪. উদ্দীপকে ‘কাবুলিওয়াদা’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে ওঠেছে ?

- i. সমাজ বাতিল  
ii. সহমর্মিতা  
iii. সহযোগিতা

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii  
খ. i ও iii  
গ. ii ও iii  
ঘ. i, ii ও iii

**সুজনশীল প্রশ্ন**

উদ্দীপক-১ : নতুন দারোয়ান সামাদ মিয়া'র সাথে হেলের বেশি ভাব-বন্ধুত্ব কিছুতেই মেনে নিতে পারেন না আবীরের মা। তিনি স্বামীকে বোঝান – বিভিন্ন ফন্দি করে মানুষ এখন অন্যের বাচ্চা চুরি করে। সামাদ মিয়াও তো একদিন তেমন কিছু করে বসতে পারে।

উদ্দীপক-২ : বারো বছর আগের ছোট্ট আবীর আজ কলেজ থেকে ফেরার পথে সড়ক দুর্ঘটনার হাসপাতালে রক্তের জন্য বাবা-মা বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখোঁজ করছেন। খবর পেয়ে সামাদ মিয়া ছুটে এসে হুটমুটে করে কান্দতে কান্দতে বলে – ‘সাহেব, আবীর বাবার জন্য আমার সব রক্ত দেন, আমার নিজের হেলেরে হারাইছি, ওরে হারাইলে আমি বাঁচুম না।’

ক. কাবুলিওয়াদার মূল কাণ্ডটিতে কী ছিল?

খ. রহমতকে কারাবরণ করতে হয়েছিল কেন?

গ. উদ্দীপক-১ অংশে ‘কাবুলিওয়াদা’ গল্পের কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘উদ্দীপকের সামাদ মিয়া যেন কাবুলিওয়াদা গল্পের মূল ভাবকেই ধারণ করে আছে’ – বিশ্লেষণ কর।

## লখার একুশে আবুবকর সিদ্দিক



লখার রাতের বিছানা ফুটপাতের কঠিন শান। এই শান দিনের বেলায় রোসে পুড়ে গরম হয়। রাতে হিয লেগে বরফের মতো ঠাণ্ডা হয়। ঠাণ্ডা শানে শুয়ে লখার নুকে কাশি বসে। পায়ে জ্বর গঠে।

বাপকে লখা সেখে নি। চেনে না। যা তার ত্যানাখানি পরে দিনভর কেঁদে-কেঁদে তিখ মেজে করে। লখার দিন কাটে গুলি খেলে, হেঁড়া কাগজ কুড়িয়ে, বন্ধুদের সঙ্গে মারামারি করে আর খাবারের দোকানের ঐটোপাতা চেটে। রাতে মায়ের পাশে লখা শিদের কই ভুলে যায়।

এই লখা, ছায়া দেখলে বুক কাঁপে বার, সে আজ তোররাতে মায়ের পাশ থেকে উঠে পড়ল। মা মুখ ঝাঁ করে দুঃস্থচ্ছে। লখা চুপি চুপি পা ফেলে হারিয়ে গেল ঘোঁরা-ঘোঁরা কুয়াশার মধ্যে।

খানিকটা এসিরে উঁচু রেললাইন যেন দুটো মরা সাপ। পাশাপাশি শুয়ে আছে চুপচাপ। লখা ইটের টুকরো দিয়ে ইম্পাতে লাইনে ঠুক-ঠুক ঠুকে তার উপর কান পাতল। হ্যাঁ, শব্দ শোনা যাচ্ছে। যেন গানের সুরলহরি বয়ে যাচ্ছে কানের ভিতর দিয়ে। লখা ভাবি মজার দুই ছেলে। গানের মজা ফুরিয়ে গেলে পর এক লাফে লাইন পেরিয়ে ওপারে পৌঁছে গেল। সেখানে যত নিচু খাদ। তার ভিতর পড়িয়ে পড়লে হাত-পা ভাঙবে নির্ধাত। খুব সাবধানে খাদ পেরিয়ে ওপারের ডাঙায় উঠে এলো সে। ডাঙাটা আসলে বনজঙ্গলে অন্ধকার। ঝিঁঝিঁ পোকা ডাকছে আর খেড়ে খেড়ে পাছের ঝাঁকড়া ছায়া মাথা নেড়ে নেড়ে ভয় দেখাচ্ছে লখাকে।

খচ করে কাঁটা ঢুকে পেল বাঁ পায়ে। কীসের কাঁটা? হবে হয়তো বাবলা-টাবলার। লখা উনু হয়ে বসে কাঁটাটা বলিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে দিলো। কিন্তু বিশ্ব তো যায় না। কী অসহ্য ব্যর্থতা। আঁ আঁ বলে কেঁদে দিলো লখা। কিন্তু কান্দলে তো চলবে না। সময় নেই আর। তাকে যে যেতেই হবে। আবছা অন্ধকার। কিনকিনে ঠাণ্ডা। পাছের পাতা বেয়ে শিশির

পড়িয়ে পড়ছে। বুক বুক করে কাশি আসছে লম্বার। খালি পা শিশিরে ভিজে শীত লাগছে। একটা হ্যাঁচড়া ডাল লম্বার হাফপ্যান্টটা টেনে ধরেছে পিছন দিক দিয়ে। প্যান্ট আখবসা অবস্থায় দৌড়াতে লাগল সে।

একটা বৈকশ্যল্য বৃষ্টি তাকিয়ে দেখছিল তাকে। দেখুক সে। এখন ভয় ভয় করলে সেটা হয়ে যাবে। কাজেই এবার চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো তাকে। আর শেষটার সেই অন্ধত্ব পাছটার নিচে পৌঁছে গেল লম্বা, যার ডালে ডালে রক্তের মতো টুকটুকে লাল ফুল। দিনের বেলায় রেললাইনের উপর দাঁড়িয়ে অবাক হয়ে থোকা থোকা ফুলের লাল ঝুঁটির পানে তাকিয়ে থাকে সে। এখন ওই উপরের এক থোকা ফুল তার পেড়ে আনা চাই।

হাতের মুঠো পাকিয়ে মনটাকে শক্ত করে নিল লম্বা। তারপর চড় চড় করে গাছে উঠে গেল। একেবারে কাঠবেড়ালির বাচ্চা যেন। মগভালের কাছাকাছি এসে কয়েকটা ভুলোমিঠের মতো বড় বড় থোকা পেয়ে গেল সে। শিশিরে ভেজা ফুলফুলে। তা হোক, তোমরা এখন আমার। নাও সব টুপটাপ নেমে এসো তো আমার মুঠোর মধ্যে। কষ্ট লাগছে। আহা! কীসের কষ্ট? এই তো একটু পরে আমি তোমাদের এমন একটা উঁচু জায়গায় নিয়ে রেখে দেবো, যেখান অবশি তোমরা এই গাছের মগভালে কোনোদিন উঠতে পারবে না। এসো, এসো, লম্বীসোনারা সব নেমে এসো তো।

ফুল নিয়ে যখন মাটিতে নেমে এলো লম্বা, তখন সারা শরীর জ্বলে যাচ্ছে তার। কনুই ও বুক চটচটে ঠাণ্ডা। হাত দিয়ে টের পায়, টাটকা রক্ত। গাছের ডালপালা কাঁটায় ভর্তি। গা-হাত-পা ছিড়ে গেছে আঁচড় লেগে। তাতে কী! জিতে গেছি আমি। পর্বে বুক ফুলে ওঠে লম্বার।

সেদিন সকাল ছিল বড় আশ্চর্য সুন্দর। আকাশে হাসকা কুয়াশা। অল্প অল্প শীত। আর দক্ষিণের সামান্য বাতাস। পথে পথে মিহিলের ঢাল নেমেছে। শত শত মানুষ। হাতে ফুলের গুচ্ছ। চোটে প্রভাতকেরির গান। বীর পায়ে শহিদ মিনারের দিকে এগিয়ে চলেছে। এই ভিড়ের মধ্যে কুসে টোকাই লম্বাকে ঠিকই দেখা যাচ্ছে। তাকে চিনতে কষ্ট হয় না। কারণ মিহিলের সবার গায়ে টানর, কোট, সোয়েটার। শুধু তার গা খোলা উলাম, পাড় কালো। হাত উপচে পড়ছে রক্তলাল ফুলের গুচ্ছ। মিহিলে পা মিলিয়ে সেও চলেছে শহিদ মিনারে ফুল দিতে। সবার সঙ্গে পলা মিলিয়ে পেয়ে চলেছে — আমার ভাইয়ের রক্তে রান্নাশো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি জুগিতে পারি? কিন্তু তার গলা দিয়ে কথা তো ছোটো না, শুধু শব্দ হয় আঁ আঁ আঁ।

আসলে কথা ফুটেবে কী করে? লম্বা যে জন্মবোবা। বাংলা বুলি তার মুখে ফুটেতে পায় না। সে মনে মনে বলে — অ আ ক থ। বাইরে শব্দ হয় — আঁ আঁ আঁ আঁ।

### স্বার্থ ও টাকার

শান	-	পাথর। এখানে কক্সিটে তৈরি ফুটপাথ বোঝাতে ব্যবহার করা হয়েছে।
ত্যানাখানি	-	পুরানো হেঁড়া কাপড়।
ভিখ	-	ভিক্ষা, ধররাত।
মেতে	-	চেয়ে।
গুলি খেলা	-	মার্বেল দিয়ে খেলা।
ছায়া দেপলে বুক কাঁপে যার	-	যে নিজের ছায়াকেও ভয় পায়। খুব ভীত।

- বিষ - যে পদার্থ শরীরে ঢুকলে যে কোনো প্রাণী অসুস্থ হয়, কখনো কখনো মারাও যায়। এখানে পথে কঁাটা ফোটার জন্য 'ব্যথা' অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
- তুলোমিঠে - তুলোর মতো সেখতে এবং মিষ্টি খাদ্য বিশেষ। একে 'হাওয়াই মিঠাই'-ও বলে।
- মগডাল - গাছের সবচেয়ে উঁচু ডাল।
- গড় - ঘন।
- প্রভাত ফেরি - ভোরবেলা দল বেঁধে পাড়ায় পাড়ায় গান গেয়ে সবাইকে জাগিয়ে তোলায় অনুষ্ঠান বিশেষ। কিন্তু বাংলাদেশে প্রভাতফেরি একটি বিশেষ অর্থ বহন করে। এটি একটি বিশেষ অনুষ্ঠান। ১৯৪৮ সালে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ব্যবহার করার দাবিতে আন্দোলন হয়। তখন ছিল পাকিস্তান। তখনকার সরকার সে-দাবি মানে না। তখন ছাত্র-জনতা তীব্র আন্দোলন করতে থাকে। সেই আন্দোলন চরমে ওঠে ১৯৫২ সালে। ১৯৫২ সালের ২১এ ফেব্রুয়ারি ঢাকার ছাত্র-জনতার মিছিলে তৎকালীন সরকারের পুলিশ গুলি চালায়। তাতে শহিদ হন রবিক, সালাম, বরকত, জব্বারসহ আরও অনেকে। তারই স্মরণে প্রতিবছর ২১এ ফেব্রুয়ারি প্রভাতফেরি করা হয়। প্রভাতফেরির সময় সকলের কণ্ঠে থাকে আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী রচিত এবং শহিদ আলতাফ মাহমুদের সুর করা গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি'।
- শহিদ মিনার - শহিদের স্মৃতি রক্ষার জন্য নির্মিত মিনার। ভাষা-আন্দোলনের শহিদদের স্মরণে ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের সন্নিহিত আমাদের কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার অবস্থিত।

### পাঠের উদ্দেশ্য

ভাষা-আন্দোলনের চেতনায় শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করা।

### পাঠ-পরিচিতি

গল্পটিতে একুশে ফেব্রুয়ারির অবিদ্যায় প্রভাবের কথা বলা হয়েছে। অতি সাধারণ এক কিশোর লখা। কথা বলতে পারে না সে। কিন্তু ডাতে কীই-বা আসে যায়। লখা উঁচু ডালে উঠে লাল ফুল সংগ্রহ করে শহিদ মিনারে যায় শ্রদ্ধা নিবেদন করতে। কথা বলতে না পারলেও তার হৃদ দিয়ে আঁ আঁ আঁ ধ্বনির মধ্য দিয়েই বেরিয়ে আসে বাঙালির গর্বের উত্তারণ — 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'।

### লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট সাহিত্যিক আবুবকর সিদ্দিক ১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দে বাগেরহাট জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দীর্ঘদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর রচিত উপন্যাসযোগ্য গ্রন্থ হলো : 'জলরাব্ব', 'খরাদাহ', 'একাত্তরের ফনরতম', 'বারুদ শোড়া গ্রহর' ইত্যাদি।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. শহিদ দিবসের ওপর শিক্ষাবীরা আলোচনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে।  
 খ. শহিদ দিবস উপলক্ষে ছড়া, কবিতা, গল্প, শ্রবছ, নাটিকা ইত্যাদির সমন্বয়ে সেরালিকা প্রকাশ করবে।

## নতুন প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. লম্বা কখন তার বিদের কষ্ট ভুলে যায় —  
 ক. যুগুতে গেলে      খ. মাকে কাছে পেলে  
 গ. খেলার সঙ্গী পেলে      ঘ. প্রভাতফেরির গান শুনেলে
২. লম্বাকে চোখ-কান বুজে দৌড় শুরু করতে হলো, কারণ —  
 ক. সে ভয় পেয়েছিল  
 খ. বাইরে অন্ধকার ছিল  
 গ. তাকে ফুল আনতে হবে  
 ঘ. মায়ের কাছে ফিরে যেতে হবে

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার সাথে প্রভাতফেরিতে এসেছে দিপু। ওর হাতে একটা টকটকে লাল গোলাপ। ওর কণ্ঠে গানের সুর 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো'। ও লাল গোলাপটিকে শহিদ মিনারের সবচেয়ে উঁচু সিঁড়িতে রাখতে চায়।—

৩. লম্বা ও দিপু মধ্য যে বিষয়ে মিল আছে তা হলো —  
 ক. শহিদ মিনারে আসা মানুষ দেখার ইচ্ছা  
 খ. শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর আবেগ  
 গ. প্রতিবন্ধকতা দূর করার অদম্য বাসনা  
 ঘ. শহিদ দিবসের গান গাওয়ার আগ্রহ
৪. দিপু ও লম্বা দুজনেই শহিদ দিবস উদযাপন করেছিল; তবুও লম্বাই প্রশংসা করেছে যে —  
 i. ভালোবাসার অনুভূতি প্রতিবন্ধকতার চেয়ে শক্তিশালী  
 ii. আত্মবিশ্বাস দ্বারা বাধাকে অতিক্রম করা যায়  
 iii. শক্তরা অত্যন্ত অনুকূতি প্রবণ

কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii      খ. i ও iii  
 গ. ii ও iii      ঘ. i, ii ও iii

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. ইশতিয়াক এবার যুগ্ম নিয়ে জাপানে লেখাপড়া করতে চলে আসায় শহিদ দিবস উদ্‌যাপন করতে পারবে না। অবশ্য প্রতিবছর সে প্রভাতফেরিতে অংশগ্রহণ করত — বক্তৃতা, আবৃত্তি, আলোচনা তদন্ত, সে-কথা মনে করে তার চোখ জলে ভরে আসে। মনে মনে কিছু করার জন্য ইচ্ছা পোষণ করে। অতঃপর ইশতিয়াক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও তার ইতিহাস সহশাঠীদের কাছে তুলে ধরার পরিকল্পনা করে।
  - ক. লখা রাতে কোথায় ঘুমায়?
  - খ. 'জিতে গেছি আমি। গর্বে বুক ফুলে ওঠে লখার'। — কথাটি ধারা কী বোঝানো হয়েছে?
  - গ. 'লখা ও ইশতিয়াক দুজনের কাছে শহিদ দিবস ভিন্ন আলিকে এসেছে।' — ব্যাখ্যা কর।
  - ঘ. 'ইশতিয়াকের শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষা লখার শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের আকাঙ্ক্ষারই প্রতিফলন।' — বিশ্লেষণ কর।



## মরু-ভাস্কর হবীবুল্লাহ বাহার



বেসব মহাপুরুষের আবির্ভাব পৃথিবী ধন্য হয়েছে – মানুষের জীবনে যারা এনেছেন সৌষ্ঠব, স্মৃতিয়েছেন লাভন্য, মরু-ভাস্কর হযরত মুহাম্মদ মোত্তাক্বা (স.) তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ।

হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবন আলোচনা করতে গিয়ে সকলের আগে আমাদের চোখে পড়ে তাঁর ঐতিহাসিকতা। হযরতের জীবনের প্রত্যেকটি ঘটনা, প্রত্যেকটি ঘটনাটি বিবরণ বেতাবে রক্ষা করা হয়েছে, সত্যের কটিপাথরে ঘষে বেতাবে যাচাই করা হয়েছে, পৃথিবীর কোনো মহাপুরুষের বেলার তা করা হয়নি।

আরবের পোকের স্মৃতিশক্তি ছিল সত্যি অসাধারণ। বিরাট বিরাট কাব্যগ্রন্থ সহজেই তারা মুখস্থ করে কেলত। আরবি সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখা যায়, মুখস্থ না করে কোনো কিছু শিখে রাখা আরবিরা লজ্জার কথা বলে মনে করতে। সাহাবিরা এবং অন্যান্য হাদিসজ্ঞারা অনেকেই হাজার হাজার হাদিস মুখস্থ করে রাখতেন।

হযরত মোত্তাক্বা (স.) মানবতার পৌরব। আল্লাহর নবী হওয়া সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষই মনে করতেন এবং সেভাবেই তিনি জীবনযাপন করেছেন। ৬৩ বছরের খুদ্র পরিসর জীবনে হযরতকে কত পরিবর্তনের সম্মুখীন হতে হয়েছে, সেখলে অবাক হতে হয়। যিনি ছিলেন এতিম, তিনি হয়েছিলেন সারা আরবজুমির অবিসংবাদিত নেতা। হযরত যখন মদিনার অধিনায়ক, তখন তাঁর ঘরের আসবাব ছিল – একখানা খেজুর পাতার বিছানা আর একটি পানির সুরাহি। অনেক দিন তাঁকে অনাহারে থাকতে হত এবং অনেক সময় উনুনে জ্বলত না আগুন।

হযরতের চরিত্রে সর্বাঙ্গীর্ণ হয়েছিল কোমল আর কঠোরের। বিশ্বাসে যিনি ছিলেন অজোয়, অকুতোভয়, সত্যে ও সজ্ঞামে যিনি বজ্রের মতো কঠোর, পর্বতের মতো অটল, তাঁকেই আবার সেখতে পাই – হৃদয়ের চেয়েও কোমল। বন্ধু-বান্ধবের জন্য তাঁর প্রীতির অন্ত নেই – মুখ তাঁর সব সময় হাসিহাসি, ছেলেশিশিরের সনে মেশেন তিনি একেবারে শিশুর মন নিয়ে – পথে দেখা হলে বালক-বন্ধুকে তার কুলবুশির খবর জিজ্ঞেস করতে তাঁর জ্বল হয় না। বন্ধুবিয়োগে

চক্ষু তাঁর অশ্রুসিক্ত হয়। বহু দিন পর দাই-মা হালিমাকে দেখে ‘মা আমার, ‘মা আমার, বলে তিনি আকুল হয়ে ওঠেন। মক্কাবিজয়ের পর সাফা পর্বতের পাদদেশে বসে হযরত বক্তৃতা করছিলেন। একজন লোক তাঁর সামনে এসে ভয়ে কাঁপতে লাগল। হযরত অক্লর দিয়ে বললেন : ভয় করছ কেন? আমি রাজা নই, কারও মুনিবও নই – এমন মায়ের সন্তান আমি, শূদ্ধ খান্দাই যার আহ্বার্থ।

হযরত জীবনে কাউকে কড়া কথা বলেননি – কাউকে অভিসম্পাত দেননি। আনাস নামক এক ভৃত্য দশ বছর হমরতের চাকরি করার পর বলেছেন – এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে হযরতের মুখে তিনি কড়া কথা শোনেননি। কখনও। মক্কার বা তায়েফে অত্যাচারে জর্জরিত হয়েও হযরতের মুখে অভিসম্পাতের বাণী উচ্চারিত হয়নি। বরং তিনি বলেছেন, এদের জ্ঞান দাও প্রভু – এদের ক্ষমা করো।

জগতে সাম্যের প্রতিষ্ঠা মোত্তফা চরিত্রের অন্যতম বিশেষত্ব। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা ও দাস-ব্যবসায়ের অত্যাচারে জর্জরিত হয়ে মানবাত্মা যখন গুমের মরছিল, রাসুলুল্লাহ (স.) যখন প্রচার করেন সাম্যের বাণী।

সমগ্র জীবন দিয়ে তিনি সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। চরম দুর্ব্বাহ্য হাত থেকে দাসদের পরিত্রাণের জন্যও তিনি কাজ করেছেন। মানুষকে সালাতে আছান করার জন্যে মুহাম্মাদিনি নিহুত করেছেন হাবশি পোশাম হযরত বেলালকে।

নারীর অবস্থার পরিবর্তন এনেছেন হযরত। নারীর মর্যাদা ছিল তাঁর শিকার অন্তর্ভুক্ত। তাঁর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-কে কেন্দ্র করে সে যুগে উঠেছে নারীত্বের আদর্শ। হযরত ঘোষণা করেছেন: বেবেশত মায়ের পায়ের নিচে।

কুসংস্কারকে হযরত কোনো দিনই প্রদ্রব্দ্য দেননি। একবার হযরতের পুত্রের মৃত্যুদিনে সূর্যমহল দেখা যায়। লোকে বলাবলি করতে থাকে – সুবি হযরতের বিপদে প্রকৃতি শোকাবেশ পরিধান করেছে। তখনি সন্তা ডেকে হযরত এই বাস্তবতাবিরোধী কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, “আল্লাহর বহু নিদর্শনের মধ্যে দুটি – চন্দ্র ও সূর্য। কাদুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ – সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না।”

হযরত জ্ঞানের গুণর জোর দিয়েছেন সব সময়। জ্ঞান যেন হারানো উটের মতো – তাকে তিনি ঝুঁজে বের করতে বলেছেন যেখান থেকেই হোক। আরও বলেছেন তিনি: জ্ঞানসাধকের দোয়াতের কালি শহীদের লহুর চাইতেও পবিত্র।

এইভাবে জ্ঞানের আলোয় মানুষের হৃদয় উজ্জ্বল করার প্রেরণা দিয়ে গেছেন তিনি।

(সংক্ষেপিত ও পরিমার্জিত)

### স্বার্থ ও টীকা

মবু-ভাঙ্গর-	মবু-ভূমির সূর্য। এখানে হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে বোঝানো হয়েছে।
সৌতব-	সুগঠন।
কটিপাথর-	যে সোনা পরীক্ষা করার এক রকম কালো পাথর।

সুদাহি-	পানির এক রকম পাত্র, সোরাহি, জলের কুঁজো।
অকুতোভয়-	যার কোনো কিছুতে ভয় নেই, নিতীক।
অতিসম্পাত-	অতিশাশ।
পরিদ্রাণ-	হুজি।
হাবশি পোলাম-	আবিসিনিয়ার (বর্তমানে ইথিওপিয়া) অনুগ্রহপ্রার্থী ক্রীতদাস।
লহু-	রক্ত।

### পার্শ্ব উদ্দেশ্য

মহামানবদের প্রতি শিক্ষাবীর প্রচ্যাবোধ জাগিয়ে তোলা।

### পাঠ- পরিচিতি

‘মক-তাকুর’ গ্রন্থে লেখক মহানবীর জীবন ও জীবনাদর্শের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন যা আমাদের ধর্মীয় চেতনা ও নৈতিকতার বিকাশে অনুকরণীয় ও অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত হতে পারে।

হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন সেই মহাপুরুষদের মধ্যে একজন যিনি চরিত্রবান; মানবশ্রেণী, জীবশ্রেণী মহীদান। বিপদে ধৈর্যশীলতা, দারিদ্র্যে অচঞ্চলতা, শত্রুর প্রতি ক্ষমাশীলতার মহৎ দৃষ্টান্তে তাঁর জীবন সমুচ্ছল। অনেক মহাপুরুষের জীবন প্রকৃত তথ্যের চেয়ে কাহিনিক নানা তথ্যে ভরা। কিন্তু হযরত মুহাম্মদ (স.)-এর জীবনের যত তথ্য পাওয়া যায় সবই ঐতিহাসিক সত্য হিসেবে স্বীকৃত।

আব্দুল্লার মহান নবী হওয়া সত্ত্বেও হযরত মুহাম্মদ (স.) ছিলেন একজন সাধারণ মানুষের মতো। তাই তিনি মানবজাতির গৌরব।

তাঁর ৬৩ বছরের ঘটনাবল্ল জীবনে, নানা পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর জীবনের মূলধারা ছিল অপরিবর্তিত। তিনি সব সময় সহজ সরল অনাড়ম্বর জীবন বাপন করেছেন। তাঁর চরিত্রে মিশে ছিল হাসিখুশি ভাব, কোমলতা ও কর্তোহতা। আপন বিশ্বাসে, সত্যের জন্য সচ্যামে তিনি ছিলেন বজ্রের মতো কর্তোহ, পর্বতের মতো অটল। কিন্তু নারী-পুরুষ, বহু-বাহুব, শিশু কিশোর, আত্মীয়-বজন সবার সঙ্গে ব্যক্তিগত আচরণে তিনি ছিলেন কুসুমের মতো কোমল। তাঁর চরিত্র ছিল প্রীতিতে, মমতায়, দ্রোহে, সৌজন্যে দগ্ধর আধার। জীবনে কাউকে তিনি কড়া কথা বলেননি, কাউকে অতিসম্পাত সেনাট। নিজে নির্ধাতিত হয়েও প্রতিসানে তিনি ক্ষমা করেছেন।

হযরত মানুষে মানুষে ভেদাভেদের পরিবর্ষে সাধ্যের বাণী প্রচার করে গেছেন। তিনি চরম দুরবস্থা-কবলিত ক্রীতদাসের পরিত্রাণের জন্য কাজ করে গেছেন। নারীর অবস্থার পরিবর্তন ও নারীর মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ছিল তাঁর জীবনের ব্রত। অন্য ধর্মের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অত্যন্ত উদার ও সহিষ্ণু।

হযরত কুসুন্ডরকে কখনও প্রহর্য সেননি। যা সত্য, যা হুজিহায, তার পক্ষেই তিনি অবস্থান নিয়েছেন। হযরত জ্ঞানচর্চার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন সব সময়। এমনকি শহীদ হওয়ার চেয়ে জ্ঞানসাধনাকে তিনি দিয়েছেন অধিকতর গুরুত্ব। এর ফলে মুসলিম সমাজ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় এগিয়ে যাওয়ার প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়েছে।

### লেখক-পরিচিতি

হবীবুল্লাহ বাহার ছিলেন কবি নজকুলের ‘ভক্ত শিষ্য’ এবং চিন্তা ও কর্মে পুরোপুরি মানবতাবাদী। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি ফেনী জেলার অনুগ্রহপ্রার্থী করেন। মূলত প্রবন্ধকার হলেও তিনি কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জীবনীগ্রন্থ রচনা করেছেন।

যেমন 'ওমর ফারুক', 'আমীর আলী ইত্যাদি। ১৯৬৬ খ্রিস্টাব্দে এহিল তিনি পরলোকগমন করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

ক. মহামানবদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনে ৫টি কাজের তালিকা কর।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ক্ষেত্রে বজ্রের মতো কঠোর ছিলেন?

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| ক. গভীর আত্মবিশ্বাসে       | খ. নারীর মর্যাদারক্ষায়         |
| গ. সত্য ও সজ্ঞামের চেতনায় | ঘ. সাম্যের প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় |

২. 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু - এদের ক্ষমা কর' - উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরত (স.) চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যটি প্রাধান্য পেয়েছে?

- |                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| ক. ক্ষমা ও মহানুভবতা | খ. দয়া ও করুণা           |
| গ. শ্রেম ও ভালোবাসা  | ঘ. বাস্তবতা ও ন্যায়বিচার |

৩. 'কাকুর জন্ম বা মৃত্যুতে চন্দ্র-সূর্যে গ্রহণ লাগতে পারে না' - উক্তিটির মধ্য দিয়ে হযরতের কোন ধরনের মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?

- |                   |                  |
|-------------------|------------------|
| ক. সাম্যবাদিতার   | খ. মানবশ্রমে     |
| গ. সংস্কারমুক্তির | ঘ. দৃঢ়বিশ্বাসের |

৪. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আরবের লোকেরা - ছিল অসাধারণ?

- |             |               |
|-------------|---------------|
| ক. সহিংসতার | খ. ধৈর্যের    |
| গ. পেশিকতার | ঘ. শৃতিশক্তির |

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১। নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং প্রশ্নসমূহের উত্তর দাও :

হযরত মুহাম্মদ (স.) সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বের কোনো অহমিকা তাঁর ছিল না। মানুষের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ছিল অফুরন্ত। সকলের প্রতি তাঁর আচরণ ছিল হাসিমাখা। ছোট ছোট শিশুদের তিনি খুব বেশি স্নেহ করতেন। তাঁর বালক-বন্ধুর সাথে দেখা হলে তিনি বন্ধুর বুলবুলি পাখির খবর নিতেও ভুলে যেতেন না।

ক. হযরত মুহাম্মদ (স.) কোন ধর্মের প্রবর্তক ছিলেন?

খ. মানুষের প্রতি হযরত মুহাম্মদ (স.) এর আচরণ কীরূপ ছিল উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা উন্নয়নে রাসূল (স.) এর আদর্শ কতটুকু ফলদায়ক হুত্বিসহ উপস্থাপন কর।

ঘ. বালক-বন্ধুর কাছে তিনি বুলবুলির খবর জানতে চাইলেন, এ ঘটনার মধ্যে দিয়ে তাঁর চরিত্রের কোন বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিশ্লেষণ কর।

## শব্দ থেকে কবিতা হুমায়ূন আজাদ



কবিতা কাকে বলে, বলা খুব মুশকিল। কিন্তু আমরা যারা পড়তে পারি, তারা কম-বেশি কবিতা চিনি। কবিতারও চেহারা আছে। বইয়ে বা পত্রিকায় যে-লেখাগুলো খুব সুন্দরভাবে ছাপানো হয়, যে-লেখাগুলো, পঙ্খিতগুলো খুব বেশি বড় হয় না, যে-গুলোতে একটি পঙ্খিত আরেকটি পঙ্খিতের সমান হয়, সে-লেখাগুলোই কবিতা। যে-লেখাগুলো পড়লে মন নেচে ওঠে; পান গেয়ে উঠতে ইচ্ছে করে, চোখে বুকে রং-বেরঙের স্বপ্ন এসে জমা হয়, তা-ই কবিতা। যা পড়লে, সু-তিনবার পড়লে আর ভোলা যায় না, মনের ভেতর যা নাচতে থাকে, তা-ই কবিতা।

কবিতা কারা লেখেন? কবিরা লেখেন কবিতা। তাঁরা একটি শব্দের পাশে আরেকটি শব্দ বসিয়ে, একটি শব্দের সাথে আরেকটি শব্দ মিলিয়ে কবিতা লেখেন। আমরা যদি কিছু বানাতে চাই, তাহলে কিছু-না-কিছু জিনিস লাগে। উপমা একটি ছুড়ি বানাতে চায়। ছুড়ি বানানোর জন্যে উপমার দরকার লাল-নীল কাগজ, সুতো, বাঁশের টুকরো। মৌলি একটি পুতুল বানাতে চায়। তার দরকার হলসে টুকরো কাপড়, সুতো, তিনটা লাল বোতাম, দুটো সবুজ কাঁটা, একটু তুলো। তেমনি কবিতা বানাতে হলো জিনিস চাই। কবিতার জন্যে দরকার শব্দ — রবেরঙের শব্দ। 'পাখি' একটা শব্দ, 'সদী' একটা শব্দ, 'ফুল' একটা শব্দ, 'মা' একটা শব্দ; এমন হাজারো শব্দের দরকার হয় কবিতা লেখার জন্যে। কবি হতে পারে কে? সে-ই হতে পারে কবি, যে লিখতে পারে কবিতা, যার ভালোবাসা আছে শব্দের জন্যে। যে শব্দকে ভালোবাসে খুব, শব্দকে আদর করে করে যে খুব সুখ পায়, সেই হতে পারে কবি। কবিরা গোলাপের মতো

সুন্দর সুন্দর কথা বলেন, তাঁদের মতো স্বপ্ন দেখেন। তুমিও গোলাপের মতো সুন্দর কথা বলতে চাও, তাঁদের মতো স্বপ্ন দেখতে চাও? তোমার যদি শব্দের জন্যে আলর-ভালোবাসা না থাকে, তাহলে পারবে না তুমি গোলাপের মতো লাল গছভরা কথা বলতে, তাঁদের মতো জ্যোৎস্নাভরা স্বপ্ন দেখতে।

তুমি কি লিখতে চাও ফুলের মতো কবিতা? বানাতে চাও নুপুরের শব্দের মতো ছড়া? যদি চাও তবে তোমাকে সারাদিন ভাবতে হবে শব্দের কথা। খেলতে হবে শব্দের খেলা। নানান রকমের শব্দ আছে আমাদের ভাষায়। তোমাকে জানতে হবে সে-সব শব্দকে। কিছু কিছু শব্দ আছে, যেতপোর গায়ে হলুদ-সবুজ-লাল-নীল-বাদামি-খয়েরি রং আছে। তোমাকে চিনতে হবে শব্দের রং। অনেক শব্দ আছে, যেতলোর শরীর থেকে সুর বেরোয় : কোনো কোনো শব্দে বাঁশির সুর শোনা যায়, কোনো কোনো শব্দে শোনা যায় হাসির সুর। কোনো শব্দে বাজে শুকনো পাতার খসখসে আওয়াজ, কোনোটিতে বেহালায় সুর। কোনো কোনো শব্দ তোমার পারের নুপুরের মতো বাজে। তোমাকে শুনতে হবে শব্দের সুর ও স্বর। অনেক শব্দ আছে বাঙলা ভাষায় যেতলোর শরীর থেকে সুগন্ধ বেরোয়। কোনোটির শরীর থেকে ভেসে আসে লাল গোলাপের গন্ধ, কোনোটির গা থেকে আসে কাঁঠালচাঁপার ম্রাণ, কোনোটি থেকে আসে বাতাবিলেবুর সুবাস। তুমি যদি দেখতে পাও শব্দের শরীরের রং, শুনতে পাও শব্দের সুর, টের পাও শব্দের সুগন্ধ, তাহলেই পারবে তুমি কবি হতে।

কবিতা শব্দ দিয়ে লেখেন নানান রকমের কবিতা। কখনো তাঁরা খুব হাসির কথা বলেন, কখনো বলেন কান্নার কথা। কখনো তাঁরা বলেন স্বপ্নের কথা, কখনো তাঁরা চারপাশে যা দেখেন, তার কথা বলেন। কিন্তু সব সময়ই তাঁরা কথা বলেন শব্দে। শব্দ বলিয়ে বলিয়ে তাঁরা বানান কবিতা। কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই জানতে হবে নানান রকমের শব্দ। তারপর আসে শব্দ দিয়ে যা বলতে চাই, তার কথা। কিন্তু কীভাবে বলা যায় সেই কথা?

কবিতায় আমরা অনেক কিছু বলতে পারি। কখনো বলতে পারি ঘর-ফাটানো হাসির কথা। বলতে পারি টগবলে রাগের কথা। বলতে পারি খুব চমৎকার ভালো কথা। কখনো বাজাতে পারি নাচের শব্দ। আবার কখনো আঁকতে পারি রঙিন ছবি। কিন্তু সব সময়ই মনে রাখতে হবে, শুই কথা নতুন হতে হবে। যা একবার কেউ বলে গেছে, যে-ছবি একবার কেউ আঁকে গেছে, তা বলা যাবে না, সে-ছবি আঁকা যাবে না। আর কথা বলতে হবে, নাচতে হবে, ছবি আঁকতে হবে ছন্দে। তাই কবিতা লিখতে হলে শব্দকে জানতে হবে, জানতে হবে ছন্দ, আর থাকতে হবে স্বপ্ন। যার চোখে স্বপ্ন নেই, সে কবি হতে পারে না। স্বপ্ন থাকলে মনে আসে নতুন ভাবনা, নেচে নেচে আসে ছন্দ, আর শব্দ।

যে কোনো বিষয় নিয়েই তুমি লিখতে পারো কবিতা। বাড়ির পাশের গলিটা, দূরের ধানখেতটা, পোখা বেড়াশাটা বা পুতুলটাকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি মনে স্বপ্ন থাকে। রাস্তার দোকানিকে নিয়ে কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। আর যা নেই, তা নিয়েও কবিতা লেখা যায়, যদি স্বপ্ন থাকে। এবার একটা কবিতা লেখা যাক। কবিতাটির নাম দিচ্ছি 'দোকানি'। রাস্তার মোড়ের দোকানদারকে তুমি-আমি চিনি। সে বিক্রি করে সাদা দুধ, খয়েরি চকোলেট, লাল পুতুল, সবুজ পান। এমন জিনিস আমরা কিনে খাই, দোকানিকে চকচকে টাকা দিই। তার জিনিসপত্র বিক্রি দেখে মাঝারি আমার একটা ভাব এসে। ভাবটা হলো : আমি একটা দোকান খুলছি দুদিন ধরে, কিন্তু সে-দোকানে দুধ, চকোলেট, পান বিক্রি হয় না। বিক্রি হয় এমন সব জিনিস, যা কেউ বেচে না, যা কেউ কেনে না। শুধু খন্দেই সে-সব জিনিস বেচাকেনা চলে। ভাবটা মাঝারি এসে, সঙ্গে শব্দ এসে, আর ছন্দ এসে। প্রথমে লিখলাম :

দুদিন ধরে বিক্রি করছি  
চকচকে খুব চাঁদের আলো  
টুকটুক লাল পাখির গান।

কথাটাই চমক দেয় সবায় আগে : চকচকে চাঁদের আলো, টুকটুক লাল পাখির গান বিক্রির ব্যাপারটা বেশ নতুন। সারা পৃথিবীতে বুজে এমন দোকান পাওয়া যাবে না। ছন্দটাও বেশ, দুলে দুলে আসছে। এ-তিনটি পঙ্ক্তি পড়ার সাথে সাথে শব্দ, ছন্দ, কথা মিলে এক রকম স্বপ্ন তৈরি হয় চোখে আর মনে। এরপর আরও এগিয়ে গিয়ে লিখলাম :

বিক্রি করছি চাঁপার গছ  
স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দ  
গোলাপ ফুলের মুখের হুল।

এখানে ছন্দ-মিল আরও মধুর। বিক্রির জিনিসগুলো আগের মতোই চমকপ্রদ। তবে এখানে স্বপ্ন আরও বেড়েছে, ছবিও আরও রঙিন। চাঁপার গছ পাওয়া গেল এবং বেজে উঠল স্বপ্নে দেখা নাচের ছন্দের নুপুর। এ-নাচ স্বপ্ন ছাড়া আর কোথাও দেখা যায় না, এমন নাচ নাচতে পারে না কেউ। ‘গোলাপ ফুলের মুখের রূপ’ বলার সাথে সাথে গোলাপ ফুল একটি মিষ্টি মেয়ের মতো ফুটে উঠল, মেয়েটির মুখ হয়ে উঠল গোলাপ, আর গোলাপ হয়ে উঠল মেয়েটির মুখ। স্বপ্ন জড়ো হলো চোখে।

কবিতাটিকে আমি আর লিখতে চাই না। ইচ্ছে হলে তোমরা লিখতে পারো। কবিতা লিখতে হলেই নতুন কথা ভাবতে হবে, আর সে-কথাকে পরিয়ে দিতে হবে শব্দ ও ছন্দের রঙিন সাজপোশাক। তোমরা এখন ছোট, এ-ছোট থাকার সময়টা বেশ সুন্দর। বারবার আমার ছোট সময়ের কথা মনে পড়ে। আমি দেখতে পাই, ছোট আমি দাঁড়িয়ে আছি পুকুরের পাড়ে, একটা সাধা মাছ লাফ দিয়ে আবার ঢুকে গেল পানিতে। দেখতে পাই শাপলা ফুটেছে, পানি লাল হয়ে গেছে। একটা চড়ুই উড়ে গেল, তার ঠোঁটে চিকন একটা ফুটে। এসব আমাকে কবিতা লিখতে বলে।

তোমরা এখন ছোট, এ বয়সে তোমরা খুব বেশি করে সেখে নেবে। যত পারো, দেখ। দেখ, দেখ এবং দেখ। বৃকের মধ্যে, মনের মধ্যে ছবি জমাও, রং জমাও, সুর জমাও। বড় হলে এ ছবি, সুর, রং তোমাদের খুব উপকার করবে। খুব ছোট বয়সে কি কবিতা লেখা উচিত? ছোট বয়সে উচিত কবিতা পড়া, পড়া এবং পড়া। চারদিকের ছবি দেখা, দেখা এবং দেখা। ছোট বয়সে বৃকে জমাবো উচিত শব্দ আর ছন্দ। তারপর একদিন, যখন বড় হবে, শব্দ, ছন্দ, ছবি, সুর, রং সব দল বেঁধে আসবে তোমার কাছে, বলবে আমাদের তুমি কবিতার রূপ দাও। তুমি হয়তো একা একা ঘরে বসে শব্দ-ছন্দ-ছবি-সুর-রং মিলিয়ে বানাবে এক নতুন জিনিস, যার নাম কবিতা।

(সংক্ষেপিত)

#### স্বার্থ ও টাকা

উপমা	-	ভুলনা। এখানে একটি মেয়ের নাম হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।
নুপুর	-	পায়ে পরার অলংকার।
চমকপ্রদ	-	যা অশব্দ করে দেয়।

#### পাঠের উদ্দেশ্য

শিকারীদের সৃষ্টিশীল হতে অনুপ্রাণিত করা।



## পাঠ-পরিচিতি

সাহিত্যের নানা রূপের মধ্যে একটি হচ্ছে কবিতা। রচনাটিতে কবিতার শিল্পরূপ ও তার বৈশিষ্ট্য অপরূপ ভাষার বর্ণিত হয়েছে। কাকে বলা যায় কবিতা? লেখকের মতে, যা পড়লে মনের ভিতর স্বপ্ন জেগে ওঠে, ছবি ভেসে ওঠে, তাই কবিতা। শব্দের সঙ্গে শব্দ মিলিয়ে লেখা হয় কবিতা।

কেবল কবিরাই লিখতে পারেন কবিতা। কেমনা কবিরাই স্বপ্ন দেখতে পারেন, তারাই পারেন স্বপ্নের ছবি আঁকতে। নতুন ছবি নতুন ভাব কেবল কবিসের চোতনায়ে খেলা করে বলে তারা লিখতে পারেন কবিতা। কবিতা লিখতে হলে শব্দের রূপ-রং-গন্ধ-বর্ণ-সুর ও ছন্দ চিনতে হয়, জানতে হয়। কবির চেনেন এবং জানেন শব্দের এসব মায়ারী রূপ। তাই তারা লিখতে পারেন কবিতা।

অনেক বিষয় নিয়েই কবিতা লেখা যায়। তবে কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন স্বপ্ন। যিনি স্বপ্ন দেখতে জানেন না, তিনি লিখতে পারেন না কবিতা। স্বপ্ন দেখার জন্য শৈশব-কৈশোরের পড়তে হবে কবিতার পর কবিতা, দুটোখ মেলে দেখে নিতে হবে যা-কিছু চোখে পড়ে, তার সবটা। অর্থাৎ কবিতা লেখার জন্য চাই অভিজ্ঞতা। কবিতার রূপ ও তার রচনা-কৌশল বর্তমান রচনার উপজীব্য।

## লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট গদ্যশিল্পী, ভাষাবিজ্ঞানী, ঔপন্যাসিক ও কবি হুমায়ূন আজাদ ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে মুন্সীগঞ্জে জন্মগ্রহণ করেন। অত্যন্ত মেধাবী হুমায়ূন আজাদ দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : কাব্য — ‘অলৌকিক ইস্টিমার’, ‘জুলো চিতাবাঘ’, ‘সব কিছু নষ্টদের অধিকারে যাবে’, ‘কাফনে মোড়া অশ্রুবিপ্লব’, উপন্যাস — ‘ছাপান হাজার বর্গমাইল’, গল্প — ‘বান্দুকের মুহূর্ত’, প্রবন্ধ — ‘লাল নীল দীপাবলি’, ‘কতো নদী সরোবর’ ইত্যাদি।

হুমায়ূন আজাদ ২০০৪ খ্রিষ্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার পড়া কোনো কবিতা বা গল্প অবলম্বনে তোমার ভালো লাগা বা ভালো না-লাগাগুলো যুক্তিসহকারে লেখ।
- খ. টেলিভিশন বা অন্য কোনো মিডিয়াতে তোমার দেখা কোনো নাটক নিয়ে একটি সমালোচনা লেখ।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কবিতা লিখতে হলে প্রথমেই কোনটি জানতে হবে?
 

ক. কথা	খ. কৌশল
গ. শব্দ	ঘ. ছন্দ

২. 'তধু যপ্নেই সেসব জিনিস বেচা-কেনা চলে।' - এ বাক্যে বেচা কেনা শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ?

- |                  |                  |
|------------------|------------------|
| ক. বিনিময় প্রথা | খ. ক্রয়-বিক্রয় |
| গ. সেলা-পাওনা    | ঘ. আদান-প্রদান   |

নিচের কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

চপল পায় কেবল খাই,  
কেবল গাই পরিণ পান  
পুলক মোর সকল পায়,  
বিভোল মোর সকল হ্রাণ।

৩. কবিতাংশে 'শব্দ থেকে কবিতা' গ্রন্থের কবিতা রচনার কোন দিকটির পরিচয় পাওয়া যায় ?

- |                  |                    |
|------------------|--------------------|
| ক. শব্দ প্রয়োগে | খ. ছন্দের ব্যবহারে |
| গ. সাবলীল ভাষায় | ঘ. উপমার প্রয়োগে  |

৪. উপর্যুক্ত বিষয়টি নিচের কোন কথাটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ?

- |                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| ক. ছবিও আরও রঙিন      | খ. দুলে দুলে আসছে |
| গ. খেলাতে শব্দের খেলা | ঘ. যত পারো দেখ।   |

### সুজনশীল প্রশ্ন

- মাহফুজা চমৎকার কবিতা লেখেন। জীবনে বিভিন্ন অংশের স্মৃতিকে শব্দের ভেতর সাজাতে পছন্দ তার। মাহফুজার ভাইপো নির্ঝর তাঁকে খুব পছন্দ করে। কারণ তিনি তাঁর ভাইপো নির্ঝরকে প্রায়ই নানা রকম কবিতা শোনান। নির্ঝর ফুফুকে পেলোই ছড়া শোনার বায়না ধরে। একদিন নির্ঝর তাকে বলে "ফুফু তুমি এতো সুন্দর কবিতা কীভাবে লেখ?" মাহফুজা উত্তর দেন, "তুমি তোমার চারপাশের সুন্দর স্বপ্নময় শব্দগুলোকে বুঝে ধারণ করে রাখবে, দেখবে তুমিও একদিন চমৎকার কবিতা লিখতে পারবে।"
- কবিতা লেখার জন্য প্রথমেই কোনটি প্রয়োজন।
- কবিতার জন্য দরকার শব্দ - রচয়িতার শব্দ - বুঝিয়ে লেখ।
- কবিতার বিষয়ে নির্ঝরের প্রশ্নের উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' গ্রন্থে কীভাবে প্রতিক্রিয়া হয়েছে- লেখ।
- মাহফুজার উত্তর 'শব্দ থেকে কবিতা' গ্রন্থের মূলভাবকে ধারণ করে কি? মুক্তিসহ বিচার কর।

## পাখি গীলা মজুমদার

ডান পাটা মাটি থেকে এক বিঘত ওঠে, তার বেশি ওঠে না। কুমু তা হলে চলে কী করে?

মাসিরা মাকে বললেন—“কিছু ভাবিসনে, রোগ তো সেরেই গেছে, এখন শুকে ঝাড়া তিন মাস সোনালুরিতে মার কাছে রেখে দে, দেখিস কেমন ঢালা হয়ে উঠবে।”

বাবাও তাই বললেন, “বাবু, তবে আর ভাবনা কী, কুমু? তা হাড়া ওখানে ওই লাটু বলে মজার ছেলেটা আছে, হেসে খেলে তোর দিন কেটে যাবে।”

কিন্তু পড়া? কুমু যে পড়ায় বড় ভালো ছিল। তা তিন মাস গেছে তয়ে তয়ে, তিন মাস গেছে পায়ে পোহার ফ্রেম বেঁধে হাঁটতে শিখে। আরও তিন মাস যদি যায় সিনিয়ার বাড়িতে, তবে পড়া সব ভুলে যাবে না?

মা বললেন, “পড়ার জন্য অত ভাবনা কীসের? লাটুর বাড়ির মাস্টার তোমাকেও পড়াবেন।”

মাসিরা বললেন, “বঁচে উঠেছিস এই যথেষ্ট, তা না হয় একটা বছর ক্ষতিই হল, তাতে কী এমন অসুবিধেটা হবে তনি?”

হাসি, রক্তা সবাই ওপরের ক্লাসে উঠে যাবে, কুমু পড়ে থাকবে, ভাবলেও কান্না পায়। কুমুর চোখ কাঁপসা হয়ে আসে।

সোনালুরিতে শিম্বার বাড়ির দোতলার বড় ঘরে, মজা জানালার ধারে আরামচেয়ারে বসে বসে চেয়ে দেখে দু'রে একটা বিল, সেখানে হাজার হাজার বৃষ্টির জলের কেঁটা পড়ছে আর অমনি বিলের জলে মিশে যাচ্ছে। আন্তে আন্তে পাটা আবার একটু তুলতে চেষ্টা করে কুমু।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, বৃষ্টি থেমে গেছে, বিলের জল সাদা চকচক করছে।

আকাশ থেকে হঠাৎ ছায়ার মতো কী বিলের ওপর নেমে এল। কুমু দেখে ঝাঁকে ঝাঁকে সাদা কিকে ছাই রঙের বুদো হাঁস কুপকুপ করে জলে নামছে।

এক ছড়া কী যেন সাদা ফুল হাতে নিয়ে লাটু এসে বলল, “ওই দেখ, বুদো হাঁসরা আবার এসেছে। শিকারিদের কী মজা! ইস, আমার যদি একটা এয়ারগান থাকত।”

কুমু বলল, “বন্দুক নেই ভালোই হয়েছে। অমন সুন্দর পাখিও মারতে ইচ্ছে করে।”

শিম্বাও তখন ঘরে এসে বললেন, “হ্যাঁ, ওদের ওই এক চিন্তা।”

কুমু বলল, “কোথেকে এসেছে ওরা?”

“যেই শীত পড়ে অমনি উত্তরের ঠাণ্ডা দেশ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসে, বাঁথের কাছে দু-তিন দিন বিশ্রাম করে, তারপর আবার দক্ষিণ দিকে উড়ে যায়, শোনা যায় নাকি সমুদ্রের ওপর দিয়ে আন্দামান অবধি উড়ে যায় কেউ কেউ।”

লাট্টি কাছে এসে ফুলটা কুমুর ষাটে রেখে বলল—“আবার শীতের শেষে ঝাঁকে ঝাঁকে সব ফিরে আসে, সেকথা তো বললে না ঠাকুরমা?”

লাট্টির কথার প্রায় সঙ্গে সঙ্গে দূরে দুম দুম করে বন্দুকের গুলির শব্দ হল, আর বুনো হাঁসের ঝাঁক জল ছেড়ে আকাশে উড়ে খুব খানিকটা ডাকাডাকি করে আবার জলে নামল।

পরদিন সকালে জানালা খুলে, পর্দা টেনে দিখা চলে গেল, কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে লেবু গাছের পাতার আড়ালে, ডাল ঘেঁষে কোনোমতে আঁকড়ে-পাকড়ে বসে রয়েছে ছোট একটা ছাই রঙের বুনো হাঁস। সন্ধ্যা লম্বা কালো ঠোঁট দুটো একটু হাঁ করে রয়েছে, পা দুটো একসঙ্গে জড়ো করা, বুকের রক্তটা প্রায় সাদা, চোখ দুটো একেবারে কুমুর চোখের নিকে একদুট্টে চেয়ে রয়েছে, কালো মখমলের মতো দুটো চোখ। একদিকের ডানা একটু খুলে রয়েছে, খানিকটা রক্ত জমে রয়েছে, সমস্ত শরীরটা ধরধর করে কাঁপছে।

পাখিটাকে দেখে কুমুর গলার ভেতরে টনটন করতে থাকে; হাত বাড়িয়ে বলে, “তোমার কোনো ভয় নেই, কোনো ভয় নেই।” পাখিটা চোখ বন্ধ করে, আবার খোলে। আর একটু ডাল ঘেঁষে বসে।

লাট্টি কুমুর কাঁধের ওপর দিয়ে উঁকি মেরে পাখিটাকে দেখতে পায়। ইস! ডানায় গুলি লেগেছে বেচারার। চুন হলুদ দিয়ে বেঁধে দিলে সেরেও যেতে পারে। বলিস তো ধরে আনি।”

কুমু বলল, “কিছু দিখা কী বলবেন?”

“কী আবার বলবেন? বলবেন ছি, ছি, নোংরা জিনিস কেসে সে, ওসব কি বাঁচে!”

কুমু জোর গলায় বলল, “নিচয় বাঁচে, চুন হলুদ দিয়ে ডানা বেঁধে, গরম জায়গায় রাখলে নিচয় বাঁচে।”

লাট্টি বলল, “কোন গরম জায়গায়?”

“কেন আমার বিছানায়, লেগের মধ্যে।”

“সেখিন, কেউ যেন টের না পায়।”

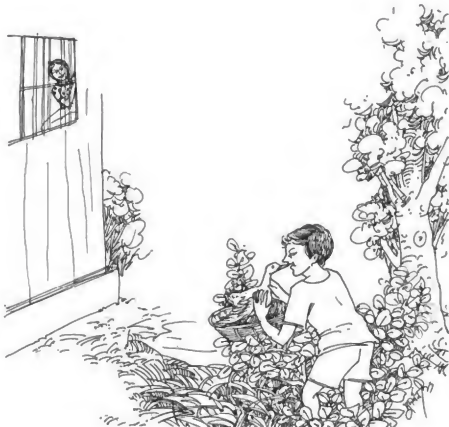
“কী করে টের পাবে, আমার বিছানা তো আমি নিজে করি। ডাক্তার আমাকে হাত-পা চালাতে বলেছে যে। আচ্ছা, ধরতে গেলে উড়ে পালাবে না তো?”

“তোমার যেমন খুজি। এক ডানায় ওড়া যায় নাকি?”

“কী বাবে ও লাট্টি?”

লাট্টি ভেবে পায় না ষাটের মধ্যে বিছানার ভিতরে কী ঝাণ্ডাবো ওকে। না খেয়ে যদি মরে যায়!

“এক কাজ করলে হয় না রে কুমু? খুজি দিয়ে, লেবু গাছের ডালে ওর জন্য একটা বাসা বেঁধে দিই, তা হলে তাক্সা ডানা নিয়ে আর পড়ে যাবে না, নিজেই পোকামাকড় ধরে খাবে।”



নিমেষের মধ্যে খুড়ি নিয়ে লাটু জানালা গলে একেবারে লেবু গাছের ডালে। ডরের চোটে পাখিটা পড়ে যায় আর কী। লাটু তাকে খপ করে ধরে ফেলে, কিন্তু কী তার ডানা ঝটপটানি, হুকরে হুকরে লাটুর হাত থেকে রক্ত বেগ্ন করে দিল। লাটু দড়ি দিয়ে শক্ত করে খুড়ি বেঁধে পাখিটাকে আঁতে আঁতে তার মধ্যে বসিয়ে দিল। অমনি পাখিটা আধমরার মতো চোখ বুঁজে ভালো ডানাটার মধ্যে ঠোট গুঁজে দিল।

লাটু সে জায়গাটাতে নিজের পা কাটার সময়কার হলদে মলম লাগিয়ে দিয়ে আবার জানালা গলে ঘরে এল। বলল, “ঠাকুরবার কাছে যেন আবার বলিস না। বলবেন হয়তো, ঝুঁস না গুটাকে।”

কুমু হাঁটতে পারে না ভালো করে, পাখিটাও উড়তে পারে না। পারলে নিশ্চয় ওই দূরে বিলে ওর বন্ধুদের কাছে চলে যেত। গাছের ডালে খুড়িতে তারার মুখ গুঁজে চুপ করে পড়ে থাকত না। কুমুর পা ভালো হলে কুমুও এখানে থাকত না। মার কাছে থাকত, রোজ ইচ্ছুরে যেত, সন্ধ্যাবেলার সাঁতার শিখত, সৌঁড় বেশার জন্য রোজ অভ্যাস করত। আর কোনোদিনও হয়তো কুমু সৌঁড়াতে পারবে না। কিছুতেই আর পারে জোর পায় না, মাটি থেকে ওই এক বিশ্বতের বেশি তুলতে পারে না। মনে হয় অন্য পাটার চেয়ে একটা একটু ছোট হয়ে গেছে।

আর একবার জানাণার কাছে গিয়ে পাখিটাকে দেখে ভালো করে, ও ডালটাকে যে নাড়া যায় না সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। পাখিটা কুড়িতে বসে আছে আশে কালো ঠোঁট দিয়ে বুকের পালক পরিষ্কার করছে। তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁটে ভর দিয়ে চুষ করে চোখ ঝুঁজে পড়ে থাকল; তারপর আবার চোখ খুলে গাছের ডাল থেকে কী একটা খুঁটে খেল।

কুমু বালিশের তলা থেকে ছোট্ট বিছুটের বাস্র থেকে একটুখানি বিছুট ছুড়ে দিল। পাখিটাও অমনি যেন পাখর হয়ে জমে গেল। বিছুটের দিকে ফিরেও চাইল না। কুমু আবার খাটে এসে বসল, নতুন গল্পের বইটা পড়তে চেষ্টা করল। পনেরো মিনিট বাসে আর একবার জানালা দিয়ে উঁকি মারল। বুকের পালক পরিষ্কার করতে করতে পাখিটা আবার কী একটা খুঁটে খেল।

গাছের ডালে পাখিটা একটু নড়ছে, একটু শব্দ হচ্ছে, কুমু ভয়ে কাঠ, এই সুঁঁ দিখা দেখতে পেয়ে মঙ্গলক বলেন, “ফেলে সে গুটাকে, বড় নোয়া, কুড়ি খুলে আন, গুটা কে বেঁধেছে ওখানো?”

কুমু জানালা দিয়ে চেয়ে দেখে পাখিটা ঘুমিয়ে আছে। কুমুও বই নিয়ে বিছানায় গিয়ে শুল। হঠাৎ জানাণার বাইরে শোরগোল। চমকে উঠে দেখে একটা হলদে বেড়াল গাছের ডালে গিয়ে উঠছে। কুমু ভয়ে কাঠ; এই সুঁঁ বেড়াল পাখিটা খেল। কিন্তু বাবে কী, অত বড় পাখি তার ভেজ কত। দিলো ঠুকরে ঠেলে ভাগিয়ে। দুটো কাক দূর থেকে মজা দেখল, কাছে ঘেঁষতে সাহস পেল না।

কুমু সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এ মাথা থেকে ও মাথা হেঁটে বেড়াতে লাগল, বোঁড়া তো হয়েছে কী, এইরকম করে হাঁটলেই না পায়ের জোর বাড়বে। দু-বার হেঁটে কুমু এসে যখন খাটে বসল, পা দুটোতে বাঘা ঘরে গেছে কিন্তু মনে হচ্ছে যেন ডান পাটা এক বিষভের চেয়ে একটু বেশিই ভালো লাগছে।

এমনি করে দিন বার, বুনা হাঁসের ডানা আন্তে আন্তে সারতে থাকে। দু-দিন পরে পাখির ঝাঁক বিল থেকে দক্ষিণ দিকে উড়ে গেল। গাছের ডালে বসে পাখিটা একটা ডানা কাপটাতে লাগল। উড়বার জন্য কী যে তার চেষ্টা। কিন্তু ভাড়া ডানা ভর সহিবে কেন, হাঁসটা খুড়ি থেকে পিছলে পড়ে নিচের ডালের ফাঁকে অটিকে থাকল। লাটু ভখনও তুল থেকে ফেরেনি, কুমু করে কী। জানাণার ধারে দাঁড়িয়ে একদুটো চেয়ে থাকল, পাখিটা অনেকক্ষণ অসাড় হয়ে খুলে থাকার পর আঁচরে-পাচড়ে নিজেই সেই ডালটার উপর চড়ে বসল। লাটু ফিরে এসে আবার গুকে তুলে কুড়িতে বসিয়ে দিল। ঠোকরালও একটু সে, তবে তেমন কিছু নয়, ডানায় আবার গুস্থ খ লাগিয়ে দিল লাটু।

এমনি করে দিন যায়, রোজ পাখিটা একটু করে সেরে ওঠে, কুড়ি থেকে ডালে নামে। আর আনন্দের চোটে কুমুও ঘরময় হেঁটে বেড়ায়, নিজের বিছানা নিজে পাতে, নিজে স্নান করে, জামা কাচে। দুপুরবেলা এক ঘুম দিয়ে উঠে নিজে বসে অঙ্ক কষে। বাড়িতে চিঠি দেখে, “মা বাবা, ভোমরা ভেবে না, আমি রোজ রোজ সেরে উঠছি, রত্নাসের বনো আমি পরীক্ষা দেব।”

এমনি করে এক মাস কাটল। তার মধ্যে একদিন খুব বৃষ্টি হয়েছিল। পাখিটা কুড়ির তলার গাছের ডালের আড়ালে গিয়ে লুকাল। তারপর বৃষ্টি থেমে আবার যখন রোদ উঠল, দিবা ডানা মেলে পালক শুকোল। কুমু অবাক হয়ে দেখল ডানা সেরে গেছে।

তার দু-দিন পরে দুপুরে মাথার অনেক ওপর দিয়ে মন্ত এক ঝাঁক বুনা হাঁস তীরের মতো নকশা করে উড়ে গেল। কুমুর পাখিও হঠাৎ কী মনে করে ডাল ছেড়ে অনেকখানি উঁচুতে উড়ে গেল, কিন্তু তখনি আবার নেমে এসে মগডালে বসল। হাঁসরাও নামল। পাখি সেই দিকেই চেয়ে থাকল।



সারা রাত বুনো হাঁসরা কিশোরী করে পরদিন সকালে যখন দল বেঁধে আকাশে উড়ল, কুমুর পাখিও তাদের সঙ্গে নিল। দল থেকে অনেকটা পেছিয়ে থাকল বটে, কিন্তু ক্রমাগত যেরকম উড়তে লাগল, কুমু লাটুর মনে কোনো সন্দেহ রইল না, এখুনি ওদের ধরে ফেলবে।

সে বিকেলে কুমু নিজে হেঁটে নিচে নামল, ডান পাটা খেন একটু ছোটই মনে হল।

কুমু বলল, “সিন্ধা, পাটা একটু ছোট হলেও কিছু হবে না, আমি বেশ ভালো চলতে পারি। বুনো হাঁসটারও একটা ডানা একটু ছোট হয়ে গেছে।”

তবে সিন্ধা তো অবাক! তখন লাটু আর কুমু দুজনে মিলে সিন্ধাকে পাখির গল্প বলল। সিন্ধা কুমুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, “ওমা, বলিসনি কেন, আমিও যে পাখি ভালোবাসি।”

(সংক্ষেপিত)

### শব্দার্থ ও টীকা

সিন্ধা	—	এখানে সিন্ধাকে “সিন্ধা” বলে সম্বোধন করা হয়েছে।
এক ছড়া	—	এক শুদ্ধ।
আদ্যমান	—	ভারত মহাসাগরে অবস্থিত ভারতের একটি দীপাঞ্চল। সমুদ্রবেষ্টিত এ অঞ্চল প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের জন্য বিখ্যাত।
অবধি	—	পর্যন্ত।
একদৃষ্টে	—	এক দৃষ্টিতে, অর্থাৎ চোখের পলক না ফেলে।
নিমেষ	—	মুহূর্ত।
বিষত	—	আথা হাত পরিমাণ।
শোরশোল	—	চিৎকার, চৈচামেচি।
আঁচরে-পাঁচড়ে	—	অনেক চেষ্টা করে।
যপতাল	—	উপরের ডাল।

## পাঠের উদ্দেশ্য

প্রাণীদের প্রতি শিক্ষার্থীদের মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।

## পাঠ-পরিচিতি

‘পাখি’ গল্পটি লীলা মজুমদারের ‘শিবকালের সেরা’ গল্প-সংকলন থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। গল্পের কিশোরী কুমু অসুস্থ হলে তা নিয়ে দুর্ভিচার পড়ে পরিবার। সহপাঠীরা সবাই উপরের ক্রাসে উঠে যাবে, কুমু নিচের ক্রাসে পড়ে থাকবে—এই নিয়ে কুমুর ভাবনার শেষ নেই। দ্রুত সুস্থতার জন্য কুমু সোনাফুরিতে সিমিমার দোস্তলা বাড়ির উদ্ভুক্ত পরিবেশে এসে একটি অত্যন্ত পূর্ণ ঘটনার সন্ধান পায়।

শিকারীর বন্দুকের গুলির আঘাতে একটি বুনোহাঁস আহত হলে কুমু তার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। পাখিটিকে সুস্থ করে তোলার জন্য সে ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সমবয়সী কিশোর লটির সহযোগিতা নিয়ে কুমু পাখিটিকে সকল বিপদ থেকে বাঁচাতে এবং দ্রুত সুস্থ হয়ে ওঠার সাহায্য করে। গল্পটির একটি অসাধারণ দিক হচ্ছে—পাখিটির সেরে ওঠার প্রতিটি ধাপ থেকে কুমু নিজেও সুস্থ হবার প্রেরণা পায়। পাখিটির প্রতি দুজন কিশোর-কিশোরীর অক্রিয় মমত্ববোধ ও সমবেদনা গল্পটিকে এক অনন্য মাত্রায় উন্নীত করেছে।

## লেখক-পরিচিতি

লীলা মজুমদার ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার বিখ্যাত রায় পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর আদি পৈতৃক নিবাস বৃহত্তর মহম্মদসিংহে। তিনি শিশু সাহিত্যিক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরীর ভাইকি। শিশু-কিশোরদের জন্য লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, নাটক ও প্রবন্ধ। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিছু বই: ‘হলসে পাখির পালক’, ‘সিন্দুপুরে’, ‘বদ্যিনাথের বড়ি’ ‘গুলির গুপ্তখাতা’। আকাশ-ছোঁয়া কল্পনা, নির্মল হাস্য-কৌতুক এবং গল্প বলার চতুর কারণে শিশু-কিশোর সাহিত্যে তিনি এক স্বর্ণীয় আসন তৈরি করেছেন। ২০০৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার পছন্দের প্রাণীসমূহের তালিকা কর।
- খ. বিভিন্ন সময় মানুষেরা কোন কোন প্রাণীর প্রতি কী ধরনের বিজ্ঞপ্তি আচরণ করে থাকে?
- গ. প্রাণীদের প্রতি উপযুক্ত মমত্ববোধ দেখানোর জন্য আমাদের আচরণে কী কী পরিবর্তন আনা উচিত?

## নতুন প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কুমুর ধারণা অনুযায়ী সিমিমা কাকে পাখিটি ফেলে দিতে বলবেন -

ক. মা	খ. মঙ্গল
গ. লাটু	ঘ. হাসীমা



২. লাটু পাখিটির ডানায় চুন-হলুদ বেঁধে দেয়। কারণ এটি -

- কত স্থানের জন্য উপকারী
- পাখিটির ডানা রঙিন করবে
- গ্রামীণ চিকিৎসা পদ্ধতি

কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

কবুতর পোখার শখ কামালের। শুল্কতে এক জোড়া কবুতর সে বাঁচাতেই পুষত। বলতে গেলে একসময় এটা দেশার দাঁড়িয়ে যায়। তাই কবুতরের আরামদায়ক বসবাসের জন্য কাঠের খোপ বানিয়ে সেগুলো টানিয়ে দিয়েছে কামাল। এখন তার পাঁচ জোড়া কবুতর।

৩. উদ্দীপকে ‘পাখি’ গল্পের কোন দিকটি ফুটে উঠেছে?

- ক. পাখি পোখার শখ
- খ. পাখির প্রতি মমত্ববোধ
- গ. পাখির প্রতি সমবেদনা
- ঘ. পাখির পরিচর্যার ব্যবস্থা

৪. উক্ত প্রতিকল্পিত দিকটি ‘পাখি’ গল্পের কোন চরিত্রসমূহে বিদ্যমান ?

- i. মা-দিদিমা
- ii. কুমু-লাটু
- iii. লাটু-দিদিমা

কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

### সুজনশীল প্রশ্ন

১। সহপাঠীদের সাথে মূল থেকে বাড়ি ফেরার পথে একটি বিড়াল ছানার করুণ ডাক শুনে থমকে দাঁড়ায় শ্রেয়সী। হঠাৎ সেবে রাস্তার পাশে একটি গর্তে একটি বিড়াল ছানা অটকে আছে। বন্ধুদের সাহায্য নিয়ে শ্রেয়সী সেটিকে পরিষ্কার করে কোলে তুলে নেয়। বাড়িতে ফেরার পর শ্রেয়সীর সেবা-যত্নে বিড়াল ছানাটি যেন গ্রাশ ফিরে পেল। খুব অল্প সময়ে সে তাদের পরিবারেরই একজন হয়ে উঠল। কিন্তু ওর ভাই সুজা তাকে সহ্য করতে পারত না, গ্রারই মারধর করতো। একদিন শ্রেয়সী মূল থেকে ফিরে বিড়াল ছানাটিকে আর খুঁজে পেল না।

ক. হাঁসরা গিরে কোখার নামল ?

খ. কুমু-লাটুর মনে কোন সন্দেহ রইল না কেন ?

গ. শ্রেয়সীর মাধ্যমে ‘পাখি’ গল্পের কোন বিশেষ দিকটি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. ‘সুজার মানসিকতা কুমু বা লাটুর মত হলে বিড়াল ছানাটিকে হাবাতে হতো না শ্রেয়সীর’ বিশ্লেষণ কর।

## পিতৃপুরুষের গল্প হাসন হাবীব

অন্তর মামা বড় বেশি একটা ঢাকা শহরে আসেন না। ওর মা চিঠি লিখে কত বলেন, কাজল তুই ঢাকা শহরে চলে আয়। আমার বাসাতেই থাকবি যদি চাকরি না হয়। কাজল মামা তবু আসে না। গ্রাম নাকি খুব ভাল লাগে কাজল মামার।

১৯৭১ সালে কাজল মামা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ত। পড়তে পড়তেই বেঁখে পেল মুন্ড। একদিন ঢাকা ছেড়ে হঠাৎ সে গ্রামে এসে হাজির। তারপর রাতদিন এ-গ্রাম সে-গ্রাম ঘুরে ছেলেদের জোশাড় করে মিছিল মিটিং। রাইফেল জোশাড় করে ট্রেনিং। আরো কত কি। অন্তর নানা কত বকতেন, 'বাবা, এসব করিস নে। বিশদে পড়বি।'

'বাবা বাঙালিরা এবার মুন্ড করবে, বাবা।' স্বাধীনতা এবার আসবেই।' সাহস নিয়ে বলত কাজল মামা।

সেই কাজল মামার মুন্ডের গল্প তখনবার জন্য অধীর অগ্রাহে অপেক্ষা করছে অন্তর। বার্ষিক পরীক্ষার পর থেকেই। মা শুকে মুন্ডি শিখিয়ে দিয়েছে, 'তুই এক কাজ কর অন্তর। চিঠি লেখ মামাকে। বল, এবারের একুশে কেন্দ্রায়িত যেন অবশ্যই ও ঢাকা আসে। আরো বল, তুই মুন্ডের গল্প তখনবার জন্য অধীর অগ্রাহে বসে আছিস। দেখবি ঠিক আসবে।'

বুড়িটা অন্তর মার হলেও এমন একটা কৌশল চিন্তা করত সে বেশ কদিন আগে থেকেই। কাউকে না জানিয়ে অন্তর চিঠি লিখেছে। সেও প্রায় দশ-বারো দিন হয়ে গেছে। আজ আঠারো তারিখ। তিন দিন বাসেই মহান একুশে কেন্দ্রায়িত। ওর কেন যেন বিশ্বাস কাজল মামা আর কারও কথা শুনত না শুনুক তার কথা রাখবেই, আসবেই সে ঢাকা।

অন্তর বরাবর রাত নটা-সাত্বে নটার ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু আজ রাতে সে দশটারও ওপরে জেগে থাকল। মা বললেন, 'ঘুমাতে বাস নে কেন?'

অন্তর খুলে বলে না কিছু। এগারোটা বাজতেই কিন্তু ঘুমে চোখ বন্ধ হয়ে আসে ওর। লেপের নিচে ঢুকতে ঢুকতেই সে কী গভীর ঘুম।

ভোরবেলায় সে দেখল কাজল মামা তার চুলে হাত বুলায়ে দিচ্ছে। লেপ থেকে বেরিয়ে এক লাফে উঠে বসল সে বিছানায়।

মামা বললেন, 'ভাল আছিস তুই অন্তর? শেষ রাতের ট্রেনে এলাম। এসে দেখি তুই ঘুমাচ্ছিস।' অন্তর বলে, 'আজ কিন্তু উনিশ তারিখ, তা তো জানো মামা। দু'দিন বাসেই একুশে কেন্দ্রায়িত।'

মামা বললেন, 'ঠিক আছে খনিচক্ষণ রেস্ট নিয়েই বেরবো তোকে নিয়ে। যেখানেই যেতে চাস সেখানেই যাব। পাঁচ দিন আমি ঢাকায় থাকব — এর মধ্যে চার দিনই তোর সাথে। যেখানে যেতে চাবি যাব। যত গল্প শুনতে চাস শোনাব।'

মোহাম্মদপুরের দুয়াজান রোড থেকে একটি রিকশায় চাপল অন্তর আর কাজল মামা। দালামাটিয়া-খানমতি হয়ে রিকশা চলছিল। মামা বললেন, 'এই যে রাস্তাটা দিয়ে আমরা যাচ্ছি এর নাম সাতমসজিদ রোড। জানিস?'

'কি যে বলো মামা। জানব না কেন।'

'ঠিক আছে বল দেখি সাতমসজিদ নাম হয়েছে কেন রাস্তাটার?'



‘তা তো ঠিক জানি না।’

‘এই জন্যই বলছিলাম, অতীতের অনেক জিনিসই জেনে রাখা ভাল আমাদের। অতীত যানে আমাদের আগের দিন। পুরনো দিনের ওপরেই তো বর্তমানের দিন-রাত গড়ে ওঠে।’

কাজল মামা সংক্ষেপে বললেন। এই ঢাকা শহরের আগের নাম জাহাঙ্গীরনগর। মোগল বাদশা জাহাঙ্গীরের নামে। সেই সময় থেকেই শহরের আনাচে-কানাচে অনেক মসজিদ তৈরি হতে থাকে। এই রাস্তাটা পিলখানার মোড় থেকে মোহাম্মদপুর এসে একটা সাতপল্লুজ মসজিদে ঠেকেছে। সেই পুরনো মসজিদের নামেই রাস্তাটার নাম হয়েছে সাতমসজিদ রোড।

রিকশাটা নিউমার্কেট পেরিয়ে নীলক্ষেত হয়ে বিশ্ববিদ্যালয় এলাকার মধ্যে ঢুকতেই অস্ত্র জিজ্ঞেস করল, ‘তুমি নাকি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে মামা?’

‘হ্যাঁ, পড়তাম একদিন। তুই জানিস কী করে?’

‘মা বলছিল তুমি বিশ্ববিদ্যালয়ে যখন পড়তে তখনই যুদ্ধে গিয়েছ।’

‘অস্ত্র, যুদ্ধ আর মুক্তিযুদ্ধের মধ্যে অনেক তফাৎ। যুদ্ধ হয় রাজায় রাজায় এক দেশে আরেক দেশে, মানুষের লোভ-লালসায়। যুদ্ধে শক্তি দেখায় একজন মানুষ — কষ্ট হয় সাধারণ মানুষের। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধ হয় স্বাধীনতার জন্য, একটি জাতি হিসেবে বেঁচে থাকার জন্য, সব অন্যায় অত্যাচার আর শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হবার জন্য। একাগ্রতার সালে আমরা মুক্তিযুদ্ধ করেছিলাম — সাধারণ যুদ্ধ নয়।’

সেখতে সেখতে রিকশাটা রোকোয়া হল আর শামসুন্নাহর হল পেরিয়ে জগন্নাথ হলের সামনে এসে পৌঁছাল। কাজল মামা বললেন, ‘এই যে ডান পাশে বিকিংটা দেখছিস ওটার নাম কি জানিস?’

‘না।’

‘জগন্নাথ হল। বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা থাকে।’

‘তুমি থাকতে এখানে?’

‘না। আমি থাকতাম হাজী মোহাম্মদ মহসীন হলে। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী এই হলের কয়েক শত ছাত্রকে ওই মাঠটাকে একসাথে দাঁড় করিয়ে গুলি করে মেরেছিল।’

‘কেন?’

‘কারণ পাকিস্তানি সামরিক শাসকেরা আমাদের বাংলাদেশটাকে গোলাম করে রাখতে চেয়েছিল। আর ছাত্রেরা বেহেতু তরুণ এবং পাকিস্তানিদের সব অন্যায়ের প্রতিবাদ করত, সেহেতু ওদের গুলির শিকার হল ওরাই প্রথম।’

কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারের সামনে এসে রিকশার ভাড়া মিটিয়ে দিলেন কাজল মামা। দুদিন বাসেই মহান একুশে ফেব্রুয়ারি। মামা বললেন, ‘অস্ত্র এই পৃথিবীতে অসংখ্য অগণিত জাতি বা গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। ওদের মধ্যে বাঁরা স্বাধীন হয়েছেন তাঁদের সেই স্বাধীনতা লাভের পেছনে প্রচুর ত্যাগ-তীক্ষ্ণতা আছে। অনেক রক্তের ইতিহাস আছে। হাজারো লক্ষ প্রাণদানের করুণ কাহিনি আছে। আর সেইসব রক্তের স্মৃতিকে ভবিষ্যতের বংশধরদের জন্য ধরে রাখতে গিয়েই দেশে এই শহিদ মিনারের মতো স্মৃতিসৌধ গড়ে উঠেছে।’

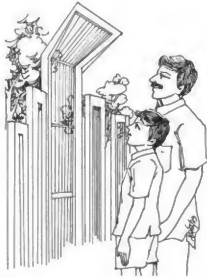
মামাকে বলে, ‘মামা এবার কি তুমি ফুল দিতে আসবে শহিদ মিনারে?’

‘আসব। গ্রামে থাকি, অনেক বছর আসতে পারি নি। এবার তোকে নিয়েই আসব। বলতো অস্ত্র, শহিদ মিনার বাঙালির স্মৃতিসৌধ কেন?’

‘মায়ের ভাষা বাংলাকে রক্ষা করতে গিয়ে এখানে অনেক বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল একদিন।’

অস্ত্র স্পষ্ট উত্তরে কাজল মামা খুব খুশি হলেন। বললেন, ‘তুমি তো বেশ কিছু জানিস অস্ত্র। তোর উত্তরে খুব খুশি হয়েছি আমি। এই শহিদ মিনার হল আমাদের ভাষা আন্দোলনের বীর শহিদদের স্মৃতির মিনার। পাকিস্তানের শাসকেরা আমাদের বাঙালিদের ওপর তাদের উর্দু ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল। কিন্তু বাঙালিরা তা মেনে নেয় নি। তাই ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঠিক এই জায়গাটায় যখন তাঁরা উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার বিকল্পে প্রতিবাদ করছিল তখনই পাকিস্তানি পুলিশ গুলি করে অনেককে হত্যা করেছে। চাপ চাপ রক্তে এই জায়গার মাটি ভিজে গেছে। ওই রক্তের বিনিময়েই আমরা বাংলা ভাষাকে প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছি।’

অস্ত্র মুখ সেধে কাজল মামা বুকলেন সে মন খারাপ করেছে। মানুষ মানুষকে গুলি করে মেরে ফেলতে পারে এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারে না অস্ত্র। মামাকে বলে, ‘মামা, তুমিও তখন এখানে ছিলে?’



‘নারে পাগল। আমি তো তখন তোর মতোই ছোট। এখানে বীরা বাহাদুর সালে রক্ত দিয়েছেন তাঁরা সবাই আমার বড়। ওরা আমাদের পিতৃপুরুষ — ওদের আমরা চিরদিন মনে রাখব — শ্রদ্ধা করব।’

কাজল মামার হাত ধরে অস্ত্র একের পর এক সিঁড়ি ভিড়িয়ে শহিদ মিনারের ওপরে ওঠে। মামার কাছে একুশে ফেব্রুয়ারির কাহিনি তখন সে অগ্রহীত হয় নিজ জাতির অতীত সংগ্রামের আরও কাহিনি শুনতে। কেউ তো আগে এমন করে বলে নি তাকে। অথচ কত কাহিনি আছে বাঙালি জাতির। অস্ত্র বলে, ‘তুমি আমাকে আরও কাহিনি বলে মায়া।’

‘একুশে ফেব্রুয়ারির দিন যখন ফুল দিতে আসবি সেদিন আরও বলব। আজ শুধু এটুকুই বলি — এই একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদসেবা হচ্ছে আমাদের জাতির প্রথম শহিদ। ওরা রক্ত দিয়েছিল বলেই বাংলা ভাষা রাষ্ট্রীয় মর্যাদা পেয়েছিল। শুধু তাই নয় একুশে ফেব্রুয়ারি থেকেই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বাঙালিদের স্বাধীনতার মূল সংগ্রাম শুরু হয়। সেই সংগ্রাম আরো উনিশ বছর ধরে চলে। এই উনিশ বছরে অসংখ্য মানুষ মারা যায়, অনেক মায়ের কোল খালি হয়ে যায়। তারপর আসে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ।’

‘সেই মুক্তিযুদ্ধে তুমি ছিলে?’

‘হ্যাঁ আমি হিলাম সেই মুক্তিযুদ্ধে।’

‘কলতে হবে কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের গল্প। বাসায় কিরে দুপুরের খাবার খেয়েই বলবে। ঠিক তো?’

‘ঠিক।’

শহিদ মিনার থেকে নেমে কাজল মামা আর অস্ত্র ছুতো পরে নেয়। ফিরে আসার সময় মামা বলেন, ‘অস্ত্র চল, আমরা দুজনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির শহিদদের শ্রদ্ধা জানাই।’

অস্ত্র ও কাজল মামা দীর্ঘবে শ্রদ্ধা জানান।

(সংক্ষেপিত)

## শব্দার্থ ও টীকা

- হানাদার বাহিনী — অন্যায়ভাবে আক্রমণকারী বাহিনী। এখানে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে বোঝাচ্ছে। এই বাহিনী বাংলার নিরীহ জনগণের ওপর হত্যাযজ্ঞ চালিয়েছে।
- তিতিকা — সহনশীলতা।
- সামরিক শাসন — সামরিক বাহিনী দ্বারা যখন রাষ্ট্রের শাসন পরিচালিত হয় তখন সেই শাসনকে সামরিক শাসন বলা হয়।
- পিতৃপুরুষ — পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ প্রভৃতি পূর্বপুরুষ।

## পাঠের উদ্দেশ্য

শিকাবীসের মধ্যে দেশ, জাতি, ইতিহাস ও ঐতিহ্য সম্পর্কে জানার আগ্রহ সৃষ্টি করা।

## পাঠ-পরিচিতি

‘পিতৃপুরুষের গল্প’ গল্পটির কিশোর অঙ্ক ঢাকায় বসবাস করে। মায়ের কাছে মুক্তিযোদ্ধা কাজল মামার সাহসী সন্ধ্যামের গল্প শুনে অঙ্কের মনে মামার মুখ থেকে মুক্তির গল্প শোনার আগ্রহ জাগে। সে মামার জন্য অধীর অগ্রহে অপেক্ষা করে। এক সময় একুশে ফেব্রুয়ারির দুদিন আগে কাজল মামা ঢাকায় আসেন। মামার কাছেই শুরু হয় অঙ্কের অতীত সম্পর্কে তথ্যনির্ভর ইতিহাসের পাঠ। অঙ্ক জানতে পারে ঢাকা শহরের নামের ইতিহাস, সাতমসজিদ রাস্তার নামের ইতিহাস। জানতে পারে মুক্তি ও মুক্তিযুদ্ধের পার্থক্য। পঁচিশে মার্চের পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর আক্রমণ ও ছাত্রদের প্রতিবাদী জুমিকার কথা। ঢাকা শহরে রিকশায় দুরতে দুরতে কিশোর অঙ্ক স্মৃতিসৌধ, মাক্তাবা আন্দোলন, শহীদ মিনারসহ বঙ্গোপী জাতির পিতৃপুরুষ কারা সে সম্পর্কে ধারণা লাভ করে।

## লেখক-পরিচিতি

কথা সাহিত্যিক হারুন হাবীব একজন গেরিলা মুক্তিযোদ্ধা এবং ৭১ এর রণাঙ্গন সর্বোদ্যোগী। তিনি মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে প্রচুর গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্মৃতিকথা লিখেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হলো: ‘প্রিয়যোদ্ধা’, ‘ছোটগল্পসমগ্র ১৯৭১’, ‘মুক্তিযুদ্ধের নির্বাহিত প্রবন্ধ’, ‘Blood and Brutality’ ইত্যাদি। তাঁর জন্ম ১৯৪৮ সালে জামালপুরে।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সন্মান প্রদর্শনে আমাদের কী কী করা উচিত – ১০টি বাক্যে তা লেখ।
- খ. তোমার গ্রাম/মহল্লার যেকোন একজন মুক্তিযোদ্ধার সফিক্ত জীবনী কমপক্ষে ১৫টি বাক্যে লেখ।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মোখল আমলে ঢাকার নাম ছিল

- |            |                 |
|------------|-----------------|
| ক. বাবরনগর | খ. দুমাহুননগর   |
| গ. আকবরনগর | ঘ. জাহাঙ্গীরনগর |



## ছবির রং হাশেম খান



ছবি আঁকতে ইচ্ছে হয়েছে?

কাগজ তো সাদা। পেনসিলে আঁকা যায়। হাতের কলমটা দিয়েও আঁকা যায় এই সাদা জমিনে।

রং হলে খুঁড়ন ভালো হয়। ইচ্ছে যতো লাল, নীল, সবুজ, বেগুনি, হলুদ, কালো রং ঘষে ঘষে সাদা কাগজটা ভরে ফেলা যায়। সুন্দর এক রঙিন ছবি আঁকা হয়ে যায়।

হলুদ, নীল ও লাল এই তিনটিই কিন্তু আসল রং। এই তিন রং থাকলে নানা রঙে ভরা পরিপূর্ণ রঙিন ছবি আঁকা যায়। এই তিনটি রং মিশিরে মিশিয়ে অনেক রং পাওয়া যায়। যেমন —

হলুদ ও নীল মেশালে পাবে সবুজ।

নীল ও লাল মেশালে পাবে বেগুনি।

লাল ও হলুদ মেশালে পাবে কমলা।

এভাবে একটির সঙ্গে আরেকটি রং বা একাধিক রং মিশিয়ে কত রকম রং যে পাওয়া যায় তার মধ্যে কয়েকটি রং ছাড়া সবগুলো সঠিক নামে চেনা সম্ভব নয়। তাই সিদ্ধান্ত হয়েছে — লাল, হলুদ ও নীল এই তিনটিই হলো মৌলিক রং বা প্রাথমিক রং। সবুজ, কমলা ও বেগুনি হলো দ্বিতীয় পর্যায়ের বা মাধ্যমিক রং এবং অন্যান্য রং পরবর্তী পর্যায়ের।

সাদা ও কালো রং ছবি আঁকার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মৌলিক রং মিশিয়ে মিশিয়ে এই দুটো রং পাওয়া যাবে না। তবে সবুজ ও লাল মিশ করে মিশিয়ে কালোর কাছাকাছি পাঁচ একটি রং তৈরি করা সম্ভব।



রংধনুর সাতটি রং। বৃষ্টির পর আকাশে যখন রংধনু হুটে ওঠে একটি একটি করে গুণে সাতটি রং বুজে বের করা যায়। হলুদ, কমলা, লাল, সবুজ, নীল, বেগুনি ও গোলাপি।

বাংলাদেশে ষড়ঋতুর দেশ। বছরের ১২ মাসকে আমরা ২ মাস করে প্রকৃতি ও আবহাওয়ার কারণে ভাগ করে নিয়েছি।

বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ এই ২ মাস গ্রীষ্মকাল। আবহাওয়া থাকে শুষ্ক ও গরম। বৃষ্টি হয় কম। গাছপালা, খাল-বিল-নদী শুকিয়ে যায়। প্রচণ্ড রোদে গাছের সবুজ-সতেজ রং বিবর্ণ হয়ে যায়। আবার হঠাৎ করে আকাশে কালো রঙের মেঘের ছুটাহুটি, বিন্দুখ চমকানো, সঙ্গে কানে তাল লাগা প্রচণ্ড শব্দে বজ্রপাত হয়। তারপর ঝড় ও বৃষ্টি। প্রকৃতিতে রঙের নানা রকম খেলা চলে। রং-বেরঙের ফল — আম, জাম, কলা, লিচু, তরমুজ এই গ্রীষ্ম ঋতুতে পাওয়া যায়। লাল, নীল, কালো, হলুদ, গোলাপি, কমলা সবুজ রঙের এই বাহারি ফলগুলোর স্বাদও মিষ্টি।

বর্ষাকাল হলো আষাঢ়-শ্রাবণ মাস। ঝিরঝিরে অল্প বৃষ্টি থেকে ঝর ঝর করে প্রবল বেগে বৃষ্টি হয় এ সময়। মাঠ-মাটি-নদী নালা ঝিল-ঝিল পানিতে টইটুখুর। পানি পেয়ে গাছপালা সতেজ হয়ে যায় — নানা রকম সবুজ রঙে ভরে যায় গাছপালা, বন-জঙ্গল, ধানক্ষেত, পটক্ষেত ইত্যাদি। সাদা ও কমলা রঙের কদম ফুল বর্ষা ঋতুর ফুল। এই ঋতুতে সতেজ ও সবুজ কচুবনে যখন কমলা রঙের লম্বা লম্বা ফুল ফোটে চমৎকার লাগে দেখতে। কচুফুল তরকারি হিসেবেও সুবান্দ।

শরৎকাল — সাদা ও সজ্জ নীলের ছড়ছড়ি। ভদ্র ও আশ্বিন — এই দুই মাস শরৎকাল। এ সময় বৃষ্টি বেশি যায়। সুন্দর নীল আকাশে পেঁজা তুলোর মতো গুচ্ছ গুচ্ছ মেঘ ভেসে বেড়ায়। গাছপালা নদীনালা প্রকৃতির সবকিছু এই ঋতুতে ঝকঝকে। নদীর ধারে ও বিলে অল্প পানিতে কাদা মাটিতে সবুজ গাছ থেকে বের হয়ে আসে নরম সাদা কাশফুল। বাতাসের দোলায় এই কাশফুল যখন দোলে, সুন্দর নরম রঙের কারণে মন তখন আনন্দে নেচে ওঠে। বিলে, পুকুরে এ সময় শাপলাফুল ফোটে। বেশির ভাগ শাপলা সাদা, লাল শাপলাও আছে — যা দেখতে খুবই সুন্দর। ভরা নদী ও খালে সাদা, লাল, নীল ও হলুদ বিভিন্ন রঙের পালতোলা নৌকা-চলাচলের দৃশ্য মোহনীয়।

হেমন্ত ঋতু হলো কার্তিক ও অগ্রহায়ণ মাস। সবুজ ধানক্ষেতের রং হলুদ হতে শুরু করে। ঋতুর শেষ দিকে — অর্থাৎ অগ্রহায়ণ মাসে পুরো মাঠে হলুদ বা পেরুয়া রঙের বাহার। ধান পেকে গিয়েছে। চাষিরা দল বেঁধে ফসল কাটা শুরু করে।

এরপরেই পৌষ ও মাঘ মাস — শীতকাল। বনে জঙ্গলে, বাড়ির আঙিনায় সর্বত্রই নানা রঙের ফুল ফোটা শুরু হয়। এই ফুল ফোটা শীতের পরে বসন্ত ঋতু পর্যন্ত চলতে থাকে। শিমুল, পলাশ আর কুমুদুড়া গাছে যখন ফুল ফোটে, হলুদে গাছের ঝলমলে হলুদ রঙের ফুলে পুরো প্রকৃতি যেন রঙের উপরে মেতে ওঠে। মাঠে তিলের ক্ষেতে সাদা ও হলুদা বেগুনি ফুল এবং সরষের ক্ষেতে ফুলে ফুলে হলুদের বন্যা নামে এই শীতকালেই। শীতের কারণে মানুষের পোশাকে আসে রঙের বৈচিত্র্য। লাল, নীল, হলুদ, কালো বিভিন্ন রঙের গরম কাপড় ও চুপি ব্যবহার করে মানুষ।

শীতকালে কুয়াশাও প্রকৃতিতে যোঁরাটে ধরনের এক মায়াবি রং আমাদের চোখের সামনে তুলে ধরে। খুবই ঠাণ্ডা ও বরফ-পড়া দেশ থেকে চলে আসে আমাদের দেশে লক্ষ পাখি। ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে এসে এরা অশ্রয় নেয় আমাদের দেশের খালে বিলে নদীতে — হাদের বলা হয় অতিথি পাখি। রং-বেরঙের পালক এসব পাখির। শীতের শেষে বসন্তের শুরুতে এরা আবার চলে যায় নিজের দেশে।

ফাছন ও চৈত্র বসন্তকাল। ষড়ঋতুর শেষ ঋতু। এ সময় গাছে গাছে যেন প্রতিযোগিতা — কে কত সুন্দর ও সতেজ ফুল ফোটাতে পারে। নানা রঙের পালকে সেজে ছোটবড় সব পাখি গাছে গাছে নেচে বেড়ায়, উড়ে বেড়ায়। ফুলের মধু খেয়ে উড়ে বেড়ায় আনন্দে। অন্যদিকে হাজার লক্ষ রঙিন প্রজাপতি। এত রং-বেরঙের যে হিসেব করা সম্ভব নয়। নানা রঙের মোহময় প্রেরণার মানুষও স্বভাবসুলভ আনন্দে মেতে ওঠে। বাসন্তী ও উজ্জ্বল রঙের পোশাকে, সাজ-সজ্জার উৎসবে মেতে ওঠে। তাই বসন্ত ঋতুই হলো রঙের ঋতু।

অনেক কাল আগে থেকেই — বাংলাদেশের ষড়ঋতুতে আমাদের পরিবেশে, নিঃসর্পে উজ্জ্বল-সুন্দর নানা রঙের যে সমাবেশ ঘটেছে — বুপের রকমফের ঘটে চলেছে — তা বাঙালির মনকে নানাতাবে প্রভাবিত করেছে। তাই আমরা দেখি আমাদের গ্রামীণ সমাজের লোকশিল্পীরা মাটির পুতুল, কাঠের পুতুল, কাপড় ও তুলার পুতুল, সোনার পুতুল, লাক্ষীসারা, শখের হাড়ি, নকশিকাঁথা, হাতপাখা, পাটি, গল্প বলার পটে তথা লোকশিল্পে উজ্জ্বল ও সতেজ রং ব্যবহার করে ছবি ও শিল্পকে সুন্দর ও মোহনীয় রূপ দিয়ে চলেছে।

ভাঁতে তৈরি কাপড়ে ভাঁতিরা এবং ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর লোকেরা তাদের তৈরি ভাঁতের পোশাকে রঙিন সুতোয় বুনাটো নানা রঙের কলমলে মনকাড়া সব শাড়ি ও পোশাক বানিয়ে চলেছে। আমাদের শিল্পী এখন ছবি আঁকে। বিভিন্ন দেশের তুলনায় বাংলাদেশের শিল্পদের ছবির রং অনেক উজ্জ্বল, সাহসী এবং মৌলিক রং যেথা। তাই খুব সহজেই বাংলার শিল্পদের ছবিকে আলাদা বৈশিষ্ট্য চেনা যায়।

চাকরলা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষাপ্রাপ্ত চিত্রশিল্পীদের ছবির সামনে দাঁড়ালে একই কথা মনে হবে। বাংলাদেশের শিল্পীরা অনেক মুক্ত সহজ ও সাহসী। লাল, নীল, হলুদ, সবুজ, বেগুনি, কমলা, কালো ও সাদা রংকে শিল্পীরা সুন্দরভাবে ছবিতে, নকশিকাঁথায়, হাতপাখায়, পুতুলে, হাড়িপাতিতে ব্যবহার করছেন। তাই বাংলার শিল্পীদের শিল্পকর্ম সারা বিশ্বে প্রশংসা পাচ্ছে।

### সমার্থ ও টীকা

খুউব	-	খুব। জোর দেয়ার জন্য বলা হয়েছে খুউব।
মৌলিক রং	-	যার মধ্যে অন্য কোনো রঙের মিশ্রণ ঘটে নি। একটি মাত্র রঙে গঠিত।
ষড়	-	ছয়।
প্রচণ্ড	-	কড়া, কঠোর।
পেকরলা	-	মেটে।
বাহ্যর	-	শোভা, সৌন্দর্য।
সর্বত্র	-	সব জায়গায়।

### পাঠের উদ্দেশ্য

ঋতুভেদে প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্যের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করে তোলা।

### পাঠ-পরিচিতি

আমরা চারপাশে গাছ-লতাপাতা, ফুল, মঠি, নদী পাহাড়-পর্বত ইত্যাদি দেখি। তাদের রূপ আছে। রং আছে। সেই রূপকে নানান রঙে নিজের মতো বঁরা আঁকেন তাঁদের আমরা বলি চিত্রশিল্পী। বিভিন্ন ঋতুতেও আমাদের চারপাশের পরিবেশের রূপ ও রং বদলে যায়। চিত্রশিল্পী তাও তাদের ছবিতে রঙে-রেখায় ফুটিয়ে তোলেন। ছবির সেই নানান রং ও রঙের বৈচিত্র্যের কথাই লেখক হাশেম খান তাঁর 'ছবির রং' লেখাটিতে ফুটিয়ে তুলেছেন।

### লেখক-পরিচিতি

শিল্পী হাশেম খান ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দে চাঁদপুর জেলার জন্মগ্রহণ করেন। এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশে চিত্রকলা বিষয়ে বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। বঙ্গবন্ধু স্মৃতি জাদুঘর ও ঢাকা নগর জাদুঘরের তিনি অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ছবি আঁকার পাশাপাশি তিনি সাহিত্যচর্চাও করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য বই: 'ছবি আঁকা ছবি লেখা', 'জয়নুল গল্প', 'তলিবিদ্ধ ৭১'।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. প্রকৃতিনির্ভর ছড়া, কবিতা বা গল্প লিখে দেয়াল-পত্রিকা প্রকাশ (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
- খ. প্রকৃতিনির্ভর ছবি এঁকে প্রদর্শনীর আয়োজন (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর দলগত কাজ)।
- গ. শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীকে নিয়ে সুন্দর হাতের লেখা প্রতিযোগিতার আয়োজন।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. ছবি আঁকার মৌলিক রংগুলো কী?
  - ক. হলুদ, সবুজ ও বেগুনি খ. লাল, হলুদ ও কমলা
  - গ. লাল, নীল ও হলুদ ঘ. হলুদ, নীল ও সবুজ
২. অগ্রহায়ণে মাঠে গেরুয়া বাহার দেখে বোকা যায়-
  - i. আকাশে রংধনু উঠেছে
  - ii. মাঠে খান পেকেছে
  - iii. মানুষের পোশাকে বৈচিত্র্য এসেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় বোনের সাথে বেড়াতে যায় সবিতা। সেখানে তার বোন তাকে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস ঘুরে ঘুরে দেখায়। হঠাৎ সবিতার চোখ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিশে আটিকে যায়। সেখানে রং বেরঙের হাজার হাজার পাখির মেলা বসেছে। কিন্তু কোন পাখিই তার পরিচিত নয়।

৩. উদ্দীপকের অচেনা পাখিগুলো ছবির রং রচনার উদ্ভিষিত কোন ক্ষতুর কথা স্মরণ করিয়ে দেয় ?

- |             |             |
|-------------|-------------|
| ক. বর্ষাকাল | খ. শরৎকাল   |
| গ. শীতকাল   | ঘ. বসন্তকাল |

৪. উদ্দীপকে উদ্ভিষিত পাখিগুলোকে আমাদের দেশে কী বলে ?

- |                 |                  |
|-----------------|------------------|
| ক. মায়বী পাখি  | খ. রংবেরঙের পাখি |
| গ. বসন্তের পাখি | ঘ. অতিথি পাখি    |

#### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গত তিনেঘরে রিংকু তার মামার বাড়ি আলোকনিয়ার বেড়াতে যায়। তার মা তাকে সেখানকার ফুলে নিয়ে যান। ফুল গ্রাশনে নানা রঙের অনেক ফুল আর প্রজাপতি দেখে সে মুগ্ধ হয়। সেখানে সে শিক্ষার্থীদের তৈরি উজ্জ্বল রঙের নানা ধরনের পুতুল, বিভিন্ন রং দিয়ে আঁকা ছবি দেখে অভিভূত হয়ে পড়ে।

- চাখীরা কোন মাসে দল বেঁধে ফসল কাটে?
- 'এ দেশের প্রকৃতি দানরূপে প্রতিফলন ঘটেছে।' - বুঝিয়ে লেখ।
- ফুলের দৃশ্যে কোন ক্ষতুর পরিচয় পাওয়া যায়?
- 'বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি পুতুল ও আঁকা ছবিগুলো যেন আমাদেরই প্রকৃতি।' - 'ছবির রং' প্রবন্ধের আলোকে এ উক্তির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।

## রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন সেলিনা হোসেন



রোকেয়া ১৮৮০ সালে রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা জহীর মোহাম্মদ আবু আদী সাবের প্রভুত হুসুন্পন্ডির অধিকারী ছিলেন। পায়রাবন্দ গ্রামে তাঁদের বাড়িটি ছিল বিশাল। সাত্বে তিন বিঘা জমির হাকখানে ছিল তাঁদের বাড়িটি।

রোকেয়া যে সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন সে সময়ে বাড়ালি মুসলমান সমাজে শিক্ষার ব্যাপক প্রচলন ছিল না। ফলে মুসলমানরা শিক্ষা-সীক্ষা, চাকরি, সামাজিক প্রতিষ্ঠার দিক থেকে পিছিয়ে ছিল। মেয়েদের অবস্থান ছিল খুবই শোচনীয়। পরদ্রব্য কঠোরভাবে মানা হতো বলে মেয়েদের শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু মেথাবী রোকেয়ার প্রবল আগ্রহ ছিল লেখাপড়ার প্রতি।

রোকেয়ার বড় দুই ভাই কলকাতার সেট জেনিয়ার্স কলেজে উচ্চশিক্ষা লাভ করেন। বোনদের আগ্রহ দেখে বড় ভাই ইব্রাহীম সাবের বোন করিমুনnesa ও রোকেয়াকে ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ত করেন। করিমুনnesa-র অনুপ্রেরণায় রোকেয়া বাংলা সাহিত্য রচনা ও চর্চায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন। রোকেয়া তাঁর রচিত ‘মতিচূর’ দ্বিতীয় খণ্ড করিমুনnesa-কে উপসর্গ করেছিলেন। উপসর্গ-পত্রে তিনি লিখেছিলেন, ‘আপাভান। আমি শৈশবে তোমারই স্নেহের প্রসাদে বর্ষপরিচয় পড়িতে শিখি। অপর আত্মীয়গণ আমার উর্দু ও ফারসি পড়ায় তত আপত্তি না করিলেও বাহালা পড়ার খোর বিরোধী ছিলেন। একমাত্র তুমিই আমার বাহালা পড়ার অনুকূলে ছিলে।’ নানা বাধা এড়িয়ে রোকেয়া আপন সাধনায় বাংলা ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। তাই রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন একজন অসাধারণ নারী।

১৮৯৮ সালে কিশোরী বয়সেই বিহারের ভাগলপুরের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেনের সঙ্গে রোকেয়ার বিয়ে হয়। স্বামীর সহযোগিতায় তিনি তাঁর পড়াশোনার চর্চা চালিয়ে যান। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ভাষায় পারদর্শী হয়ে ওঠেন।

সাহিত্যিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রকাশ ঘটে ১৯০২ সালে। কলকাতা থেকে প্রকাশিত ‘নবপ্রভা’ পত্রিকায় ছাপা হয় তাঁর প্রথম রচনা ‘পিপাসা’। বিভিন্ন সময়ে তাঁর রচনা নানা পত্রিকায় ছাপা হতে থাকে। ১৯০৫ সালে প্রথম ইংরেজি রচনা ‘সুলতানাজ জিম’ মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ছাপা হয়। তাঁর রচনা সুধীমহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত হয়ে ওঠেন।

১৯০৯ সালে সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন মারা যান। রোকেয়া ভাগলপুরে তাঁর নামে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল পার্লস স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। তখন স্কুলের ছাত্রী ছিল পাঁচ জন। ১৯১১ সালে এই স্কুলটি তিনি কলকাতায় স্থানান্তর করেন। তৎকালে ছাত্রীসংখ্যা ছিল আট। আস্তে আস্তে স্কুলে ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

রোকেয়া বাঙালি মুসলমান মেয়েদের শিক্ষিত করার জন্য শুধু স্কুলই প্রতিষ্ঠা করেন নি, ঘরে ঘরে গিয়ে মেয়েদের স্কুলে পাঠানোর জন্য বাবা-মায়ের কাছে আবেদন-নিবেদন করেছেন। এই কাজে তিনি ছিলেন একজন নিরলস পরিশ্রমী কর্মী। তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টার ফলে নারীশিক্ষার অগ্রগতি সূচিত হয়। মেয়েরা ধীরে ধীরে শিক্ষার আশোর নিকে এগোতে থাকে।

১৯১৫ সালে তিনি ‘আজুমানে খাওয়াতিনে ইসলাম’ নামে একটি মহিলা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। এই প্রতিষ্ঠান থেকে দুঃস্থ নারীদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা হতো। তাদের হাতের কাজ শেখানো হতো, সামান্য পেছাপড়া শেখানোর ব্যবস্থাও ছিল। এক কথায় এই সংগঠনটির লক্ষ্য ছিল সমাজের সাধারণ দুঃস্থ নারীদের স্বাবলম্বী করে তোলা।

রোকেয়ার প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচটি: ‘মতিচূর’ ১ম খণ্ড (১৯০৪), ‘সুলতানাজ জিম’ (১৯০৮), ‘মতিচূর’ ২য় খণ্ড (১৯২২), ‘পদ্মরাগ’ (১৯২৪) ও ‘অবরোধবাসিনী’ (১৯৩১)।

রোকেয়া এই উপমহাদেশের একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মানুষ। নারীশিক্ষার অগ্রদূত হিসেবে সমগ্র বাঙালি সমাজের তিনি শ্রদ্ধেয়। বিশ শতাব্দীর সূচনায় তিনি দুইভাবে নারীদের মুক্তির পথ দেখেছিলেন। এক, মেয়েদের জন্য স্কুল স্থাপন করে, দুই, নিজের রচনায় নারী মুক্তির দিক নির্দেশনা দিয়ে।

তিনি ১৯০২ সালের ৯ই ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

#### সন্দর্ভ ও টীকা

প্রকৃত	-	প্রচুর।
ভূসম্পত্তি	-	জমিজমা।
সামাজিক প্রতিষ্ঠা	-	সমাজে গৌরবময় অবস্থান। সমাজে গণ্যমান্য হওয়া।
শোচনীয়	-	খুব দুঃখজনক।
প্রবল	-	প্রচণ্ড, তীব্র।
অগ্রহ	-	ইচ্ছা।
অনুপ্রেরণা	-	উৎসাহ, কোনো বিষয়ের কারণে মধ্যে ইচ্ছা জাগানো।
খণ্ড	-	ভাগ, অংশ।

বর্ণপরিচয়	-	বালাভাষা শেখা শুরু করার জন্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের লেখা একটি বই।
বালালা	-	বালা। ‘বালা’ বোকাতে বালালা শব্দটি একসময় ব্যবহার করা হতো। ‘বালালা’ শব্দটিই ‘বালা’র পরিণত হয়েছে।
অনুকূলে	-	পক্ষে।
নিরলস	-	হার অলসতা বা কুঁড়েমি নেই।
স্বাবলম্বী	-	স্ব — নিজ। যে নিজেই নিজের অবলম্বন।
দূরদৃষ্টিসম্পন্ন	-	দূরদৃষ্টি — দূরকে দেখার দৃষ্টি। এখানে দূর বলতে ভবিষ্যৎ কাল বোঝানো হয়েছে।
বিশে	-	বিশ বা কুড়ি।
অগ্রদূত	-	পথপ্রদর্শক।

### পাঠের উদ্দেশ্য

নারীর কর্মজগতের প্রতি প্রত্যাশা জাগ্রত করা।

### পাঠ-পরিচিতি

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন বাংলাদেশের নারী-আন্দোলনের অগ্রদূত। বিশ শতকের শুরুর দিকে যখন এদেশের নারীরা শিক্ষা-সীক্ষা ও সকল অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল তখন তিনি প্রায় একক চেষ্টায় মেয়েদের শিক্ষার জন্য আন্দোলন গড়ে তোলেন। তাঁর এই আন্দোলনের হাতিয়ার ছিল কলম — লেখালেখি। একটি শিক্ষিত ও সংস্কৃতিবান পরিবারের সদস্য ছিলেন তিনি। কিন্তু তারপরও অনেক প্রতিবন্ধতার ভিতর দিয়ে তাঁকে শিক্ষাগ্রহণ করতে হয়েছে। ফলে নারীশিক্ষার প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে তিনি ভালোভাবেই অবগত ছিলেন। এই পটভূমিতেই তিনি তাঁর লেখালেখির জগৎকে যৌক্তিক ও শাণিত করে তোলেন। ফলে অনিবার্যভাবেই নারীমুক্তির আন্দোলনে তাঁর অবদান অত্যন্ত তরুণ।

### লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক ও গল্পকার সেলিনা হোসেন ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দে রাজশাহীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস লক্ষীপুর জেলা। সেলিনা হোসেনের উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘জলোচ্ছ্বাস’, ‘হাঙর নদী গ্রেনেড’, ‘ময় চৈতন্যে শিশু’, ‘পোকামাকড়ের ঘরবসতি’, ‘মুক্তিযুদ্ধের গল্প’ ইত্যাদি।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. শিক্ষার্থীরা তার দেখা একজন নারীর (মা, বোন, শিক্ষিকা প্রমুখ) কর্মজগৎ নিয়ে রচনা লিখবে (একক কাজ)।



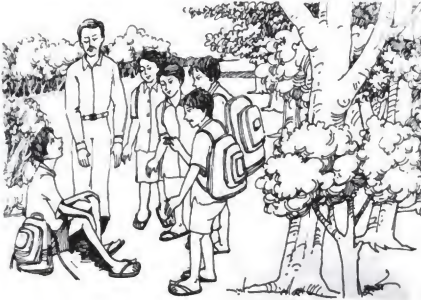


### স্বজনশীল প্রশ্ন

শরীফা ও নীলা দুজনেই মানব সেবার নিয়োজিত। শরীফা বুজে বুজে অসহায় মেয়েদের হুঁরে ভর্তি করিয়ে দেন। শত বাধা এলেও এ বিষয়ে তিনি আপোস করেন নি। অন্যদিকে নীলা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অর্থ দিয়ে কয়েকটি সেবা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছেন। সেখানে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষকে, রোগ, দুঃখ ও দারিদ্র্য থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কাজ করেন।

- ক. বেগম রোকেয়া কার অনুপ্রেরণায় সাহিত্য রচনায় আত্মহী হয়ে ওঠেন?
- খ. বেগম রোকেয়ার সময়ে নারীর অবস্থা কেমন ছিল? সুস্থিরে লেখ।
- গ. শরীফার কাজে বেগম রোকেয়ার কোন দিকটি হুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. মানব সেবার ক্ষেত্রে নীলা ও বেগম রোকেয়ার ভূমিকার তুলনামূলক আলোচনা কর।

## সেই ছেলেরি মায়ুর রশীদ



### ১ম দৃশ্য :

(গ্রামের পাশ দিয়ে যাচ্ছে শোমেন, সাবু ও আরজু। সবাই পান পাইতে পাইতে ফুলে যাচ্ছে। বেশ তাড়াতাড়ি তাদের। একসময় হঠাৎ থেমে যায় আরজু। ওরা আরজুকে কেলেই চলে যায়। আরজুর ব্যথা পায়ে। সাবু ফিরে আসে।)

সাবু - কী হলো আবার?

আরজু - আমি যে আর হাঁটতে পারছি না।

সাবু - রোজ রোজ তোর জন্য আমি স্যারের বকুনি খেতে পারব না।

আরজু - ঠিক আছে তোরা যা, আমি একাই এতুনি যাব।

সাবু - থাক ডাহলে।

(চলে যায় সাবু। আরজু বসে পড়ে। এ সময়ই ঐ পথ দিয়ে যাচ্ছিল এক আইসক্রিমওয়াল।)

আইসক্রিমওয়াল - আইসক্রিম, আইসক্রিম চাই আইসক্রিম। কী হলো আরজু মিয়া, তুমি এখানে বসে কী করছ?

আরজু - কিছু না।

আইসক্রিমওয়াল - ফুলে যাবে না?

আরজু - না।

- আইসক্রিমওয়াল - কুলে ফাঁকি দেওয়া কিন্তু খুব খারাপ, আমিও খুব কুল ফাঁকি দিতাম। আমার অবস্থা দ্যাখো। যদি লেখাপড়াটা করতাম তাহলে কি আর আইসক্রিম কেরি করতে হতো? যাও কুলে যাও। চাই আইসক্রিম, আইসক্রিম।
- আরজু - তাই শোন — তুমি কোন দিকে বাজ?
- আইসক্রিমওয়াল - আমি তো যায ঐ বাজারের দিকে।
- আরজু - আজ কুলের দিকে যাবে না? আইসক্রিম খাব, টকিন পিরিয়ন্ডের সময় —
- আইসক্রিমওয়াল - ক্লাস যখন চলে তখন তো আর আইসক্রিম বিক্রি হয় না। আমার বাজারের সময় চলে যায়। চাই আইসক্রিম (আইসক্রিমওয়াল চলে যায়। হাওয়াই মিঠাইওয়ালার প্রবেশ।)
- আরজু - তাই শোনো।
- হাওয়াই মিঠাইওয়াল - শুধু শুধু ভাকছ কেন? এভাবে সময় নষ্ট হলে আমার হাওয়াই মিঠাই যে শূন্যে মিলিয়ে যাবে।
- আরজু - তোমার হাওয়াই মিঠাই কি মেঘের হতো যে, মেঘ জমছে আর শূন্যে মিলিয়ে যাচ্ছে।
- হাওয়াই মিঠাইওয়াল - হ্যাঁ, মেঘের চাইতেও অনেক হালকা — তাই তো মিলিয়ে যায়। হাই — চাই হাওয়াই মিঠাই (চলে যায়)।
- আরজু - এখন আমি কী করব? বাড়ি গেলে বাবা বলবে কুলে ফাঁকি দেয়ার মতলব — কুলে গেলে স্যার বলবে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি তো দাঁড়িয়ে থাকতে পারব না। এখন কী হবে?

২য় দৃশ্য :

(টকিনের খণ্টা বাজে। সোমেন, সাবু ও আরো ছেলে-মেয়েরা টকিন পিরিয়ন্ডে বেরিয়ে আসছে। তারা খেলছে। এ সময়ে আসেন শিক্ষক লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার - এই সাবু, এদিকে শোন — আজ্য আরজুকে দেখছি না যে?
- সাবু - স্যার মাঝপথে এসে আরজু বলল তোরা যা। এরকম মাঝে মাঝেই করে আরজু।
- লতিফ স্যার - কিন্তু কেন করে?
- সাবু - এমনিই।
- লতিফ স্যার - এমনিই মানে? ইচ্ছে করে? না কি কোনো সমস্যা আছে ওর?
- সাবু - জানি না স্যার।
- লতিফ স্যার - আজ্য। এই যে সোমেন, এদিকে শোনো, তোমার কী মনে হয় আরজু কি ইচ্ছে করেই কুল কামাই করছে?
- সোমেন - স্যার, ওর যে কী হয়? হঠাৎ করে বলে আমি আর যেতে পারছি না, তোরা দাঁড়া। তখন ওয়ানিকেল বেজে গেছে। আর কি দাঁড়াতে পারি? তাই তো চলে আসি, সেটাই ভালো না স্যার?
- লতিফ স্যার - কোথায় যেন একটা সমস্যা মনে হচ্ছে।
- মিঠু - স্যার ঐ হেলেটার সাথে আমারও দেখা হয়েছে।
- লতিফ স্যার - কোথায়?
- মিঠু - ঐ যে পলাশতলীর আমবাগানের ওখানে বসে আছে। আমার সাথে নানান কথা।

- লতিফ স্যার - নানা কথা? তাহলে ছুঁলে এশো না কেন?
- মিঠু - একসময় বলল তুমি কি ছুঁলের দিকে যাবে? আমি বললাম না — এখন বাজারে যাব। তারপর তিকিন শিরিয়ডের দিকে ছুঁলের দিকে যাব।
- লতিফ স্যার - তাহলে তো খুবই চিন্তার কথা। আজ্ঞা ঐ আমবাগানে কি এখনো আছে?
- সোমেন - মনে হয় এতক্ষণে বাড়ি চলে গেছে।
- লতিফ স্যার - তোমরা চলো তো —
- সাবু - স্যার (ওদের চোখে বুঝে অনিচ্ছা)। হাওয়ারই মিঠাইওয়াল হেকে চলছে— হাওয়ারই মিঠাই। লতিফ স্যার ওদের দুইজনকে নিয়েই রওনা দেন।)

ওয় দৃশ্য :

(আমবাগান। অসহায় আরজু বসে আছে। একা সে উঠে দাঁড়ায়। একটা পাখি ডাকছে। তাকে অনুসরণ করার চেষ্টা করছে সে।)

- আরজু - পাখি, একটু নিচে নাম না। তোমার সাথে কথা কই। আমাকে ছুঁলে নিয়ে যাবে? সাবু, সোমেন ওরা কেউ নিয়ে পেল না। তুমি নিয়ে যাও না। তোমার ভানায় ভর করে চলে যাব। কী হলো? নেমে গেলে কেন? মেঘ আমার নিয়ে যাও না। তোমার কোলে বসে চলে যাব ছুঁলে। কী বলছো? ভিজ়ে যাব? ভিজ়লাম। আবার শুকিয়ে যাব — তবুও তো স্যার বুঝবেন, ছোট পাখি চন্দনা, এই যে শালিক আমাকে দেখতে পাচ্ছ না? আমি একলা বসে আছি। আমার বুকটা কেটে যাচ্ছে। আমার সাথে কথা বল না — চন্দনা আমার নিল না, মেঘ আমার নিল না — শালিক আমার সাথে কথা বলে না।

(আরজু কঁদতে থাকে। হঠাৎ উপহিত হয় লতিফ স্যার।)

- লতিফ স্যার - আরজু, তুমি কঁদছ কেন? তোমার কী হয়েছে? তুমি ছুঁলে যাও নি কেন?
- সোমেন - কঁদিস কেন? স্যারকে বল না। (আরজু কঁদছেই)
- লতিফ স্যার - কোনো ভয় নেই, বল।
- আরজু - স্যার, আমি বেশি দূর হাঁটতে পারি না। পা দুটো অবশ হয়ে আসে।
- লতিফ স্যার - তোমার বাবা-মাকে বল নি কেন?
- আরজু - বশেছি — বাবা বলেন হাঁটা-হাঁটি করলেই ঠিক হয়ে যাবে।
- লতিফ স্যার - তোমার পা দুটো দেখি — এ তো রোগ, তোমার পা টিকন হয়ে গেছে।
- আরজু - মা জানে, সেই ছোটবেলায় কী যেন অসুখ হয়েছিল সেই থেকেই পাটা টিকন — মা বোকে কিন্তু কঁদে মুখ।
- লতিফ স্যার - তোমরা খেয়াল কর নি?
- সোমেন - না স্যার।
- লতিফ স্যার - তোমাদের বন্ধু না?
- সোমেন - জী স্যার।
- লতিফ স্যার - তোমার যদি এরকম হতো?
- সোমেন - আমরা বুঝতে পারি নি স্যার। এরকম বুঝলে আমরা দুজনে ধরে এইভাবে নিয়ে যেতাম। (দুজনেই কাঁধে হাত দিয়ে গুকে তুলে ফেলে।)
- লতিফ স্যার - বশো ছুঁলে যাবে? না কি বাড়ি যাবে?

- আরজু - ফুলে স্যার। (ওদের কাছে হাত তুলে আরজু ফুলে যায়।)  
 লতিক স্যার - চলো। দেখি তোমার চিকিৎসার জন্য আমরা কী করতে পারি।

### স্বার্থ ও টীকা

- সেই ছেলেটি - 'সেই ছেলেটি' নামক এই লেখাটি একটি নাটক। এটি এ বইয়ের আর সব লেখার মতো নয়। এতে কয়েকজন বিশেষ বিশেষ জায়গায় থেকে নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এ ধরনের রচনা কেবল পড়ার জন্য নয়। এগুলো যজ্ঞ অভিনয় করে লোককে দেখানো হয়। এ ধরনের লেখা বড় পরিসরে থাকলে তাকে বলে নাটক।
- দৃশ্য - নাটক বা নাট্যকার বিষয়গুলোকে ঘটনাছল অনুসারে ভাগ করে নেয়া হয়। এক-একটি ঘটনাছলকে 'দৃশ্য' বলা হয়। 'সেই ছেলেটি' নাটকের তিনটি ঘটনাছলকে তিনটি দৃশ্যে ভাগ করে দেখানো হয়েছে। ১ম দৃশ্য — গ্রামের পাশের রাস্তা। ২য় দৃশ্য — সারু, আরজুদের স্থল। ৩য় দৃশ্য — আমবাগান।
- মতলব - উদ্দেশ্য বা ফন্দি।

### পাঠের-উদ্দেশ্য

বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টি।

### পাঠ-পরিচিতি

নাট্যকার মামুনুর রশীদ রচিত 'সেই ছেলেটি' একটি নাটক। এ নাটকটিতে একটি বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন (শারীরিক ও মানসিকভাবে সুবিধাবঞ্চিত) শিশুর প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। একই সাথে প্রকাশ পেয়েছে শিশুর প্রতি বড়দের মমত্ববোধ। আরজু, সোমেন ও সারু তিন বন্ধু একই স্থলে একই শ্রেণিতে পড়ে। কিন্তু বিদ্যালয়ে হেঁটে আসতে আরজুর খুব কষ্ট হয়। মাকে মাকে তার পা অবশ হয়ে আসে। বন্ধুদের সাথে সমান তালে চলতে পারে না। কখনও কখনও বসে পড়ে। বন্ধুরা আরজুর জন্যে আঙুলে আঙুলে হাঁটে। তাতে স্থলে যেতে দেরি হয়ে যায় এবং ওরা শিক্ষকের কাছে বহুনি খায়। আসলে হয়েছিল কি, আরজু ছোটবেলার ভীষণ অসুখে পড়েছিল। তাতে তার পা সুরু হয়ে যায়। কিন্তু আরজু জানে না কেন তার পা অবশ হয়ে আসে। তার মা জানেন আরজুর অসুখের কথা। তিনি কাঁদেন।

একদিন স্থলে যাওয়ার পথে পা অবশ হয়ে গেলে, আরজু বন্ধুদের স্থলে চলে যেতে বলে। সে রাস্তার পাশে বসে থাকে। আইসক্রিমওলাসা আসে, হাওয়াই মিঠাইওলাসা আসে। সে তাদের সাথে কথা বলে। তারা চলে যায়। আরজু তাতে পাখি কিংবা মেঘ তাকে যদি উড়িয়ে নিয়ে স্থলে দিয়ে যেত।

এদিকে শিক্ষক লতিক স্যার আরজুকে ক্লাসে না দেখে সোমেনদের কাছ থেকে ঘটনাটি জেনে সোমেনদের সঙ্গে নিয়ে আরজুর খোঁজে রওয়ানা হন। আরজুকে দেখে তিনি বুঝতে পারেন যে আরজুর পা অবশ হয়ে আসা একটা রোগ। তখন লতিক স্যারের কথায় সোমেনদের মনে সহানুভূতি জাগে। তাদের সহায়তায় আরজু স্থলে যায়।

### লেখক-পরিচিতি

মামুনুর রশীদ বাংলাদেশের বিশিষ্ট নাট্যকার, অভিনেতা ও নির্দেশক। তিনি ১৯৪৮ খ্রিষ্টাব্দে টাঙ্গাইলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর রচিত উল্লেখযোগ্য নাটক হলো : 'ওরা কদম আলী', 'ওরা আছে বলেই', 'ইবলিশ', 'পিলিপিশ', ইত্যাদি।

## কর্ম-অনুশীলন

- বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি মমত্ববোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে জনসচেতনতা সৃষ্টির জন্য পোস্টার, প্র্যাকার্ড, ব্যানার তৈরি করে র্যালির আয়োজন কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।
- নাটিকাটি অভিনয় করে প্রদর্শনের ব্যবস্থা কর (শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীর কাজ)।

## নমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- সেই ছেলেটি নাটিকার দৃশ্য সংখ্যা করটি?
 

ক. দুইটি	খ. তিনটি
গ. চারটি	ঘ. পাঁচটি
- আরজু তার বন্ধুদের সাথে ছুঁলে যেতে যেতে বসে পড়ে কেন?
 

ক. সে ছুঁলে যেতে চায় না	খ. স্যার তাকে বন্ধুনি দিতে পারে
গ. তাঁর ছুল ফাঁকি দেওয়ার ইচ্ছা ছিল য.	রোসের কারণে সে ইটতে পারে না
- 'মা বোভে কিঙ্ক কাসে' কারণ -
 

ক. ছেলের পা চিকন হয়ে যাচ্ছে
খ. ছেলের পা একদিন পলু হয়ে যেতে পারে
গ. ছেলের পায়ের কোনো চিকিৎসা হচ্ছে না
ঘ. ছেলের এই অবস্থার তিনি অসহায়

উদ্দীপকটি পড়ে ৪ ও ৫ নং প্রশ্নের উত্তর দাও।

রেবেকা কাছের জিনিস দেখতে পায় কিঙ্ক- দূরের জিনিস কাপসা দেখে। একদিন সে লক্ষ করল দূরের কাপসা জিনিস অর্ধেক দেখা যাচ্ছে আর অর্ধেক পুরো অন্ধকার। মাকে জানালে তিনি বললেন চোখে পানি দিলে ঠিক হয়ে যাবে। কিঙ্ক ভা হয়নি। বরং অবস্থা আরও খারাপ হচ্ছে।

- রেবেকা কোন ধরনের শিশু?
 

ক. স্বাভাবিক	খ. পুষ্টিহীন
গ. সুবিধাবঞ্চিত	ঘ. বুদ্ধিহীন
- সেই ছেলেটি নাটিকা অনুযায়ী রেবেকার প্রয়োজন-
  - মাতা পিতার সহানুভূতি
  - সমাজের সহানুভূতি
  - স্বাস্থ্য সম্পর্কিত ধারণা

কোনটি সঠিক ?

ক. i

খ. i ও ii

গ. i ও iii

ঘ. ii ও iii

### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. আবিদ স্যার ৭ম শ্রেণির ছাত্র রওশনের কাছে তার ছুঁলে অনুপস্থিতির কারণ জানতে চাইলে সে কিছু না বলে হুপ থাকে। শ্রেণির অন্য শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞেস করলে তারা গ্রায় একযোগে বলে — স্যার, রওশন গ্রায়ই ছুঁল কামাই করে। শিক্ষক রওশনকে বলেন-আর কামাই করবে? কোনো উত্তর দেয় না রওশন। পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলি নিয়ে মেঝে ঝুঁড়তে থাকে। উত্তর না পেয়ে শিক্ষক রওশনকে অনেক বকা দেন। কয়েকদিন পর রওশনের বাবা আবিদ স্যারকে বলেন- স্যার, রওশনের দ্রাবু রোগ আছে। নিরমিত ছুঁল করলে ওর অসুখটা বেড়ে যায়। বকাঝকা করলে ওর ছুঁলে আসা বন্ধ হয়ে যাবে।  
 ক. মিঠু আরজুকে কোথায় বসে থাকতে দেখেছে?  
 খ. আইসক্রিমওয়লা আরজুকে ছুঁল ফাঁকি দিতে নিষেধ করল কেন? বুঝিয়ে লেখ।  
 গ. রওশন ও আরজুর মধ্যকার সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর।  
 ঘ. আবিদ স্যারের বিচার কাজটি লভিক স্যারের তুলনায় কতটুকু যৌক্তিক হয়েছে তা মূল্যায়ন কর।

# বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা

এ. কে. শেরাম

আমাদের শ্রিয় মাতৃভূমি এই বাংলাদেশ বহু জাতি, বহু ভাষা ও বহু সংস্কৃতির একটি দেশ। এখানে প্রধান জনগোষ্ঠী বাঙালির পাশাপাশি রয়েছে প্রায় অর্ধশত ক্ষুদ্র জাতিসত্তা। তেমনি দেশের প্রধান ও রক্ত্রিভাষা বাংলার পাশাপাশি রয়েছে অনেক ভাষা এবং এসব জাতিগোষ্ঠীর নানা বর্ণের বিভিন্ন সংস্কৃতিও। তারপরও আমরা সবাই জাতীয়তার পরিচরে এক এবং দেশকে ভালোবাসার ক্ষেত্রেও ঐক্যবদ্ধ। বৈচিত্র্যের মধ্যেও এই যে একতার শক্তি এটিই আমাদের বাংলাদেশকে সুন্দর ও বর্ণময় করে তুলেছে।

বাংলাদেশে বসবাসরত ক্ষুদ্র জাতিসত্তার সংখ্যা নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে। তবে সাধারণভাবে এই সংখ্যা ৪৬টি বলে অনুমিত। পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবানের বিভিন্ন পাছাড়ি জনপদ ছাড়াও দেশের সমতলভূমি যেমন কক্সবাজার, পটুয়াখালি, বরগুনা, ময়মনসিংহ, জামালপুর, টাঙ্গাইল, বগুড়া, রাজশাহী, পাবনা, দিনাজপুর ও সিলেট অঞ্চলে প্রধানত এদের বসতি। এইসব জনগোষ্ঠী শত শত বৎসর ধরে এই ভূখণ্ডে বসবাস করছে। তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে নিজস্ব ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। প্রতিটি জাতিগোষ্ঠীর কাছে তাদের ভাষা ও সংস্কৃতি খুবই শ্রিয়।

বাংলাদেশে যেসব সংখ্যালঘু জাতিসত্তার বাস তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো— চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, গারো, সাঁওতাল, মণিপুরি, খাসি, শ্রো, রাখাইন, হাজং, তঞ্চঙ্গ্যা, বম, কোচ, পাছাড়িয়া, রাজবংশী, মালো, ওরাও ইত্যাদি। এদের মধ্যে প্রধান কয়েকটি জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতির পরিচয় সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো।

## চাকমা

মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত চাকমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজমাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান জেলায়। নিজেদের মধ্যে তারা 'চাঙমা' নামে পরিচিত। তারা আর্ষ ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। তাদের নিজস্ব হরফও আছে। চাকমারা পিতৃতান্ত্রিক। পিতাই পরিবারের প্রধান। চাকমা সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। গ্রামের যাবতীয় সমস্যা তিনিই নিষ্পত্তি করেন। চাকমারা প্রধানত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তবে তার পাশাপাশি এখনও তারা কিছু কিছু প্রকৃতিপূজাও করে থাকে। চাকমা পুরুষেরা 'হুতি' ও মহিলারা 'পিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের ভাতে তৈরি 'সিদ্দুহ' (জামা) পরে। মেয়েরা 'বাদিকৈ' ওড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

চাকমাদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ, মাংস ও শাক-সবজি। চাকমা জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন শৌকিক আচার অনুষ্ঠান থাকে। বিয়ের সময় ছেলের অভিভাবককে ঘটকসহ কনের বাড়িতে কমপক্ষে তিনবার হাওরা-আসা করতে হয়। প্রতিবার চূড়ানি, পান-সুপারি ও পিঠা নিয়ে যেতে হয়। বিজ্ঞ উৎসব চাকমাদের একটি প্রধান উৎসব। চৈত্রের শেষ দুইদিন 'মুলবিজ্ঞ' ও 'মুলবিজ্ঞ' এবং পহেলা বৈশাখকে 'গরখ্যাপর্যা' বলে আখ্যায়িত করে থাকে তারা। লোকনৃত্যগীত হিসেবে 'ছুমনাচ' ও 'বিজ্ঞানাচ' বেশ জনপ্রিয়।

## গারো

গারো জনগোষ্ঠীর প্রধান বসতি ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও সিলেট অঞ্চলে। মঙ্গোলীয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত গারোরা মাতৃসূত্রী। মেয়েরা পরিবারের সম্পত্তির মালিক হয়। বিবাহের পর বর জীবন বাড়িতে গিয়ে বসবাস করে থাকে। সন্তান-সন্ততিরা মায়ের পদবি ধারণ করে। তবে পরিবার, সমাজ পরিচালনা ও শাসনে পুরুষেরাই দায়িত্ব পালন করে থাকে। একই গোড়ে বিবাহ গারো সমাজে নিষিদ্ধ। গারোদের নিজস্ব ধর্ম আছে। এটি এক ধরনের প্রকৃতি পূজা।



গারোরা প্রধানত কৃষিজীবী। পাহাড়ে বসবাসকারীরা জুম চাষ করে। আর সমতলভূমির গারোরা নারী ও পুরুষ একসাথে সাধারণ নিয়মে কৃষিকাজ করে। গারোরা জন্ম থেকে মৃত্যু অবধি জীবনের নানা পর্যায়ে বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক আচার-অনুষ্ঠান পালন করে। অলঙ্কারও ব্যবহার করে থাকে। গারো সংস্কৃতিতে গীতবাদ্য ও নৃত্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের নিজস্ব কিছু বাদ্যযন্ত্রও আছে। ফসল বোনা, নবান্ন, নববর্ষ ইত্যাদি উপলক্ষে বিভিন্ন উৎসবের আয়োজন হয়। ‘ওরানপালা’ গারোদের একটি জনপ্রিয় উৎসব।

### মারমা

মহালৌয় জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত মারমাদের প্রধান বসতি পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবান, রাঙামাটি ও ঝাংগাছড়িতে। মারমা ভাষাও মহালৌয় ভাষা পরিবারের। তাদের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মারমারা প্রাচীনকাল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। তারা বিয়ের সময় ধর্মীয় ও লোকাত্মিক মিলিয়ে নানা অনুষ্ঠান পালন করে। নিজেদের গোঁড়ে বিবাহকে মারমা সমাজে উৎসাহিত করা হয়। মারমারা শিষ্টাচারিক। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে ছেলে ও মেয়েদের সমান অধিকারের কথা বলা আছে। ভবে পরিবার ও সমাজজীবনে পুরুষেরই প্রাধান্য থাকে। বিয়ের পর নারী-পুরুষ ইচ্ছে করলে মা-বাবার বাড়ি কিংবা স্বস্তরবাড়িতে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে পারে। মারমাদের সামাজিক শাসনব্যবস্থার রাজা প্রধান। মারমারা জুম চাষ করে এবং বনজ সম্পদ আহরণের মাধ্যমে জীবিকানির্ভর করে।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হলেও মারমারা এখনও বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা এবং নানা আচার-অনুষ্ঠানাদি পালন করে। তাদের সবচেয়ে বড় উৎসব হলো নববর্ষে সাংখাই দেবীর পূজা এবং এ উপলক্ষে আরোজিত সাংখাই উৎসব তিন দিন ধরে চলে।

### মণিপুরি

বাংলাদেশের স্ত্রী জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে মণিপুরি জাতি অন্যতম। এদের আদি নিবাস ভারতের মণিপুর রাজ্য। এদের মধ্যে কোনো কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব বর্ণমালাও আছে। মণিপুরিরা যেখানেই বসতি স্থাপন করে সেখানে কয়েকটি পরিবার মিলে গড়ে তোলেন পাড়া। প্রতিটি পাড়াতেই থাকে সেবমন্দির ও মতপ। ঐ মন্দির ও মতপকে ঘিরেই আবর্তিত হয় ঐ পাড়ার যাবতীয় ধর্মীয় ও সামাজিক কর্মকাণ্ড। মণিপুরি সমাজে পাড়া বা গ্রাম ও ‘পালচাম’ বা পঞ্চায়তের জুমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।



চিত্র : নৃত্যরত মণিপুরি

মণিপুরি জনগোষ্ঠী সাতটি গোত্রে বিভক্ত। মণিপুরিসের প্রাচীন ধর্মের নাম 'আগোকাশা'। তবে মণিপুরিসের অধিকাংশই এখন সনাতন ধর্মের চৈতন্যমতের অনুসারী। মণিপুরিসের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ ইসলাম ধর্মাবলম্বী। সনাতন ধর্মাবলম্বী মণিপুরিসের প্রধান উৎসব রাস উৎসব, রথযাত্রা ইত্যাদি। রাস উৎসব উপলক্ষে রাসনৃত্য ও পেশার আয়োজন করা হয়ে থাকে। মণিপুরিরা প্রধানত কৃষিজীবী। ভাত, রাই, শাক-সবজি মণিপুরিসের প্রধান খাদ্য। মণিপুরি পুরুষেরা সাধারণত মুক্তি, গামছা, জামা ইত্যাদি পরিধান করে। আর মেয়েরা পরে নিজেদের তৈরি বিশেষ ধরনের শোষাক।

### মিপুরা

পার্বত্য চট্টগ্রামের খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি, রাঙ্গামাটি, কাছাই এবং চট্টগ্রাম জেলা, বুড়ার কুমিল্লা, নোয়াখালি ও সিলেট অঞ্চলে বসবাসকারী মিপুরা জনগোষ্ঠী মঙ্গোলীয় রথজাতির অংশ। তাদের ভাষার নাম 'ককবরক'। এদের নিজস্ব কোনো বর্ণমালা নেই। মিপুরা সমাজব্যবস্থা পিতৃতান্ত্রিক। ছেলেরাই সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মিপুরারা বর্তমানে সাধারণভাবে সনাতন হিন্দু ধর্মাবলম্বী। কিন্তু তারা এখনও তাদের প্রাচীন লোককল ধর্মের নানা সেব-সেবীর পূজা অর্চনা এবং বিভিন্ন অনুষ্ঠানাদি করে।

মিপুরা মেয়েরা কাপড় বরনে খুবই লক্ষ্য। তারা নিজেরদের পরনের কাপড় নিজেরাই তাঁতে তৈরি করে। পুরুষেরা পরিধান করে নিজেরদের তৈরি গামছা ও মুক্তি। মিপুরারা কৃষিজীবী। তারা পাখড়ে ছদ্ম চাষ করে। মিপুরাদের সঙ্গীত ও নৃত্য খুবই সমৃদ্ধ। তাদের মধ্যে বিভিন্ন সঙ্গীতের প্রচলন যেমন আছে, তেমনি আছে নানা প্রকারের নৃত্যও। মিপুরাদের প্রধান উৎসব নববর্ষ বা কৈসুখ। মিপুরা জনগোষ্ঠীর 'বৈসুখ', মারমাসের 'সাজ্জাই' ও চাকমাসের 'বিছু' উৎসবের প্রথম অক্ষর নিয়ে 'বৈসাবি' উৎসব এখন নববর্ষ উপলক্ষে পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতীয় উৎসব।

### সাঁওতাল

সাঁওতাল জনগোষ্ঠীর লোক প্রধানত উত্তরবঙ্গ ও সিলেটের চা বাগানে বসবাস করে। তাদের ভাষা আঙ্গিক পরিবারের। সাঁওতাল সমাজ পিতৃতান্ত্রিক। সম্পত্তির মালিকানাধীন এবং সমাজ ও পরিবারে পুরুষই প্রধান। সাঁওতালদের নিজস্ব ধর্ম আছে। কিন্তু কোনো ধর্মগ্রন্থ নেই। পেশার দিক থেকে সাঁওতাল জনগোষ্ঠী প্রধানত দুই অংশে বিভক্ত— কৃষক ও হাবিক। অনেকের অন্তর্গত কৃষি যেমন প্রধান জীবিকা তেমনি অনেকে আবার হাবিক হিসেবে বিভিন্ন জায়গায় কাজ করে থাকে। ব্রিটিশ-নিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনে সাঁওতালদের সজ্জামী ছুরিকা বিশেষ করে 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' ও 'নাচোল কৃষক বিদ্রোহ' ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছে।



চিত্র : সাঁওতাল নৃত্য

সাঁওতালরা খুবই পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। বাড়িঘর লেপে মুছে পরিষ্কার রাখা হয় এবং দেয়ালে নানা রঙ দিয়ে ছবি আঁকা হয়। 'সোহরাই' হচ্ছে সাঁওতাল সমাজের শ্রেষ্ঠ উৎসব। এটা অনেকটা পৌষ-পার্বণের মতো। সাঁওতাল নৃত্য মেয়ে-পুরুষ দলবদ্ধ হয়ে নাচে। তাদের কুমুর নাচ খুবই জনপ্রিয়।

বাংলাদেশের এইসব ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক জাতিসত্তার জীবন ও সংস্কৃতি আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে — বর্ষিল ও বৈচিত্র্যপূর্ণ করেছে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নেও রয়েছে তাদের বিরাট অবদান। তারা আজ জাতীয় মূলধারারই অংশ।

(সংক্ষেপিত)

### শব্দার্থ ও টীকা

ক্ষুদ্র জাতিসত্তা	—	বাংলাদেশের জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশ হচ্ছে বাঙালি। বাঙালি ছাড়া আরও কিছু ক্ষুদ্রতর জনগোষ্ঠী বা জাতি আছে, যারা ভাষা, সামাজিক রীতি-নীতি প্রভৃতির দিক থেকে বাঙালিদের মতো নয়। এ সকল জাতিসত্তার এক-একটিকে বলা হয়েছে 'ক্ষুদ্র জাতিসত্তা'। যেমন : চাকমা, মারমা, সাঁওতাল, হাজং, ত্রিপুরা ইত্যাদি।
সংস্কৃতি	—	বাড়ি, গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের আত্মপরিচয় পাওয়া যায় এমন সব বৈশিষ্ট্যকে বলা হয় সংস্কৃতি। বাঙালির কিছু বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে, সেগুলোর দ্বারা বাঙালিকে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠী থেকে আলাদা করা যায়। তেমনি ক্ষুদ্র জাতিসমূহের সংস্কৃতিও আলাদা আলাদা। তবে নাগরিকত্বের পরিচয়ে বাংলাদেশের সকলেই এক ও অভিন্ন।
আর্থভাষা	—	ইউরোপে প্রথম উত্তর ঘটেছে এমন একটি প্রদান ভাষাগোষ্ঠীর নাম ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। তার একটি শাখার নাম আর্থ ভাষা। এই আর্থ ভাষা থেকে বাংলা, হিন্দি ওড়িয়া, চাকমা প্রভৃতির ভাষার সৃষ্টি হয়েছে।
পিতৃতান্ত্রিক		
পরিবার	—	মানব সমাজে দু'রকমের পরিবার প্রকার সৃষ্টি হয়েছে: (ক) পিতৃতান্ত্রিক, (খ) মাতৃতান্ত্রিক। পরিবারের প্রধান নেতৃত্ব, অর্থনৈতিক ক্ষমতা ও সম্পত্তি যদি পুরুষের হাতে থাকে তাহলে সে রকমের পরিবারকে বলা হয় পিতৃতান্ত্রিক পরিবার। আর যে পরিবার প্রকার উক্ত নেতৃত্ব ও ক্ষমতা নারীর হাতে থাকে, তাকে বলা হয় মাতৃতান্ত্রিক। বাঙালিদের মতো চাকমাদের পরিবার পিতৃতান্ত্রিক। তবে একালে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারেও পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের প্রভাব পড়েছে।
খাদি	—	হাতে কাটা (মেশিনে নয়) সুতা দিয়ে তৈরি কাপড়।
দৌকিক আচার	—	অনুষ্ঠান-স্থান ও জাতি বিশেষের ঐতিহ্যগত আচার-অনুষ্ঠান যার মধ্যে বর্তমান নাগরিক রুচির প্রভাব পড়ে নি, তাকে দৌকিক আচার-অনুষ্ঠান বলা হয়।
মাতৃসূত্রীয় পরিবার	—	কিছু সমাজ আছে যেখানে পুরুষগণ সমাজ পরিচালনা ও শাসনের অধিকারী হলেও নারীদের পরিচয়েই পরিবার পরিচিতি হয়। এ ধরনের পরিবারকে মাতৃসূত্রীয় পরিবার বলে। যেমন : গারো পরিবার।
পদবি	—	উপাধি, যা নামের শেষে যোগ করে বংশ পরিচয় দেয়া হয়। পদবি বলতে কর্মক্ষেত্রে স্তর বা মর্যাদাও বোঝায়।

জুম	—	পাহাড়ি চাষাবাসের বিশেষ পদ্ধতি।
মসোলীয়া ভাষাপোষ্ঠী	—	একটি ভাষাপোষ্ঠী; এই ভাষাপোষ্ঠীর অন্তর্গত প্রতিটি ভাষার আলাদা রূপ ও বৈশিষ্ট্য আছে।
মতপ	—	পূজা বা সভা-সমিতির জন্য হৃদযুক্ত চতুর্।
বয়ন	—	বোনা।

### পাঠের উদ্দেশ্য

বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন ক্ষুদ্র জাতিপোষ্ঠী সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

### পাঠ-পরিচিতি

বাংলাদেশে মূল জনগোষ্ঠী হচ্ছে বাঙালি জাতি। বাঙালি ছাড়াও এদেশে আরো অনেক জাতিগোষ্ঠীর মানুষ বাস করে। ক্ষুদ্র এই জাতিসত্তার মধ্যে আছে চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, মিশুরা, সাঁওতাল প্রভৃতি জনগোষ্ঠী।

ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর প্রত্যেকটিরই রয়েছে স্বতন্ত্র পরিচয়, নিজস্ব সংস্কৃতি ও জীবনাচার। ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে কয়েকটি সম্পর্কে এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা হয়েছে। চাকমা, গারো, মারমা, মণিপুরি, মিশুরা ও সাঁওতালদের সম্পর্কে সঠিক্ত এই আলোচনা বৃহত্তর জাতীয়তাবোধ সৃষ্টিতে সহায়ক হবে বলে ধারণা করা যায়।

বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীর সংস্কৃতি ও জীবনাচার আমাদের জাতীয় সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে, করেছে বৈচিত্র্যময় ও বর্ণিল। দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীসমূহ গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে।

### লেখক পরিচিতি

বাংলাদেশে মণিপুরি সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে পথিকৃৎ কবি ও প্রাবন্ধিক এ. কে. শেরাম। তাঁর জন্ম ১৯৫২ খ্রিষ্টাব্দে হবিগঞ্জে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো : ‘বসন্ত কুন্নি পালগী লৈরাং’, ‘মণিপুরি কবিতা’, ‘চৈতন্যে অধিবাস’, ‘মনিদীত মণিপুরি ও বিষ্ণুপ্রিয়া বিতর্ক’ ইত্যাদি।

### কর্ম-অনুশীলন

ক. তোমার এলাকার বিভিন্ন লোকজ-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের পরিচয় দিয়ে একটি রচনা লেখ (একক কাজ)

### নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মিশুরা জনগোষ্ঠীর উৎসব কোনটি?

ক. সাঙ্ঘাই	খ. বিজু
গ. বৈসুখ	ঘ. সোহরাই

২. বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জাতীয় মূলধারারই অংশ কারণ, তারা-

- i. আমাদের সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে
- ii. জাতীয় সমৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে
- iii. ধর্মীয় দিক থেকেও তারা গুরুত্বপূর্ণ

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. iii ও i | ঘ. i, ii ও iii |

উদ্দীপকটি পড়ে ও ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বাবার চাকরির সুবাদে সুমি সিলেটের একটি ছুলে ভর্তি হয়। সেখানে সুসি দাড়াই নামে একটি মেয়ের সাথে তার বন্ধুত্ব হয়। কথা প্রসঙ্গে সুমি জানতে পারে 'দাড়াই' সুসির মায়ের পদবী। শুনে তার কাছে অস্বস্ত লাগে যে বিয়ের পর সুসির বাড়িতেই তার বর চলে আসবে।

৩. উদ্দীপকে বাংলাদেশের ক্ষুদ্রজাতিসত্তা রচনার কোন জাতিসত্তার পরিচয় পাওয়া যায় ?

- |          |            |
|----------|------------|
| ক. চাকমা | খ. মারমা   |
| গ. গারো  | ঘ. সাঁওতাল |

৪. উদ্দীপকের জাতি সত্তা আমাদের জাতীয় জীবনে গুরুত্বপূর্ণ কারণ, তারা আমাদের-

- i. সংস্কৃতির ধারক
- ii. অবিচ্ছেদ্য অংশ
- iii. ঐতিহ্যকে ধারণ করেছে

নিচের কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১। বাহার তার বন্ধু সঞ্জীবের সাথে একটি পার্বত্য অঞ্চলে বেড়াতে যায়। সেখানে গিয়ে সে জানতে পারে স্থানীয় লোকজন সবাই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী, পিতৃতান্ত্রিক। তারা দেব-দেবীর পূজা করে এবং নববর্ষ এলে সাংগ্রহী উৎসব পালন করে। সেখানে কয়েকদিন থাকার পর তারা অন্যর বেড়াতে যায়। সেখানকার সমাজের প্রধান হলেন রাজা। গ্রামের প্রধান হলেন কারবারি। সেখানে পুরুষেরা খুঁতি ও মহিলারা 'শিনন' পরিধান করে থাকে। পুরুষেরা নিজেদের তৈরি 'সিলুম' পরে। মেয়েরা খাদিকে গুড়না হিসেবে ব্যবহার করে।

- ক. চাকমারা পহেলা বৈশাখকে কী বলে আখ্যায়িত করে?
- খ. পঞ্চায়তের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ — কেন?
- গ. উদ্দীপকের প্রথম স্থানটি 'বাংলাদেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তা' রচনার কোন জাতিসত্তাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. শেষ স্থানটি বাংলাদেশের একটি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বৈশিষ্ট্যকে ধারণ করে। উদ্দীপক ও রচনার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## নতুন দেশ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নদীর ঘাটের কাছে  
নৌকো বাঁধা আছে,  
নাইতে যখন যাই, দেখি সে  
জলের তেউরে নাচে ।  
আজ দিয়ে সেইখানে  
দেখি দূরের পানে  
হাঙ্গনদীতে নৌকো, কোথায়  
চলে ভাঁটার টানে ।  
জানি না কোন দেশে  
পৌছে যাবে শেষে,  
সেখানেতে কেমন মানুষ  
থাকে কেমন বেশে ।



থাকি ঘরের কোণে,  
সাথ জাগে মোর মনে,  
অমনি করে যাই ভেসে, তাই,  
নতুন শপথ বনে।

দূর সাগরের পারে,  
জলের ধারে ধারে,  
নারিকেলের বনগুলি সব  
দাঁড়িয়ে সারে সারে।

পাহাড়-হুড়া সাজে  
নীল আকাশের মাঝে,  
বরফ ভেঙে ভিড়িয়ে যাওয়া  
কেউ তা পারে না-যে।

কোন সে বনের তলে  
নতুন ফুলে কলে  
নতুন নতুন গুণ কত  
বেড়ায় দলে দলে।

কত রাতের শেষে  
নৌকো যে যায় ভেসে।

বাবা কেন আপিসে যায়,  
যায় না নতুন দেশে?



## শদ্যর্থ ও টীকা

- উঁটা — চাঁদ ও সূর্যের শক্তির আকর্ষণে সমুদ্র বা নদীতে বেড়ে ওঠা জলের কমে যাওয়ায় বলা হয় উঁটা।
- অসিস — অসিস শব্দের একটি কথ্য রূপ।

## পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর অনুসন্ধিৎসা, কল্পনাপ্রতি ও স্বজনশীলতা জাগ্রত করা।

## পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজ পাঠ’ গ্রন্থের প্রথম ভাগ থেকে নেওয়া হয়েছে। এ কবিতায় অজানাকে জানার সীমাহীন কৌতূহল এবং প্রকৃতির সকল রহস্য উন্মোচন করার অপার আকাঙ্ক্ষার কথা প্রকাশিত হয়েছে। উঁটার টানে ঘাটে বাঁধা নৌকা মাঝ নদী পেরিয়ে কোথায় গিয়ে যে পৌঁছবে তার কোন ঠিক নেই। হয়তো কোনো নতুন দেশে বা নতুন পরিবেশে গিয়ে সে পৌঁছবে। এ সব প্রশ্নের উত্তর জানতে কৌতূহল জাগবে যে কারোই। হয়তো কোনো অসীম সৌন্দর্য বা অজানা আনন্দ বা অপার বিস্ময় তার জন্য অপেক্ষা করে আছে। অজানার প্রতি এই ব্যতুলতা শিশুরা তার আশপাশের সবার মধ্যেও দেখতে চায়।

## কবি-পরিচিতি

এশীয়দের মধ্যে যিনি প্রথম নোবেল পুরস্কার পেয়ে বিশ্বসত্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে মর্যাদার আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তিনি হলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দে ৭ই মে (২৫এ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতার জোড়াসাঁকোর বিখ্যাত ঠাকুর পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ছুঁলে নিয়মিত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা তাঁর হয় নি। সতেরো বছর বয়সে বিলেতে ব্যারিস্টারি পড়তে গিয়েছিলেন। সে-পড়া শেষ না হতেই দেশে ফিরে আসেন তিনি। কিন্তু ‘শিক্ষা’ ও সাধনায় একক অবদানে তিনি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যকে এত সমৃদ্ধ করেছেন যে যার কোনো তুলনা নেই। কাব্য, ছোটগল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত সাহিত্যের সকল শাখা তাঁর আত্মক অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে। ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব, ছন্দ ও চিত্রকলাতেও তিনি অসামান্য অবদান রেখেছেন।

অনন্যসাধারণ তাঁর প্রতিভা। তিনি একাধারে সাহিত্যিক, চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, সুরকার, গীতিকার, নাট্যকার, নাট্যপ্রযোজক ও অভিনেতা। ঐনিকেনন ও বিশ্বভারতীর মতো প্রতিষ্ঠান গড়ে তিনি শিক্ষায় নতুন ধারা সৃষ্টি করেছেন। রবীন্দ্রনাথের একটি দেশপ্রেমমূলক গান বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত। রবীন্দ্রনাথের লেখা গ্রন্থের সংখ্যা অনেক। ছোটদের জন্য লেখা তাঁর বিদ্রূপ রচনা সংকলিত হয়েছে ‘কৈশোরক’ নামে একটি গ্রন্থে।

১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দের ৭ই আগস্ট (২২এ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ) কলকাতায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

## কর্ম-অনুদান

- ক. তোমার কল্পনার দেশের একটি বর্ণনা প্রস্তুত কর।
- খ. তোমার এলাকার প্রাকৃতিক পরিবেশের বর্ণনা দাও।
- গ. সর্বশেষ তুমি যে অঞ্চলে ভ্রমণ করেছ তার বর্ণনা লেখ।



## নতুন প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

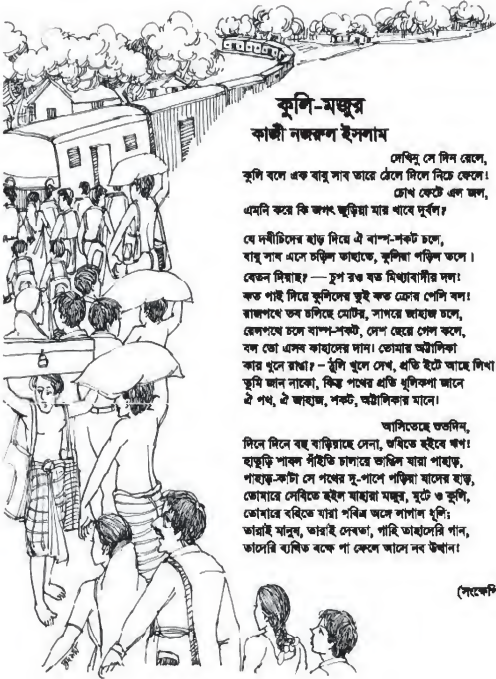
১. জলের ধারে কী দাঁড়িয়ে আছে ?  
ক. নতুন নগর                      খ. পাহাড় হুড়া  
গ. নারকেল বন                    ঘ. নতুন পত
  ২. "অমনি করে যাই ভেসে, তাই / নতুন নগর বনে।"  
-এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে ?  
i. অসীম সৌন্দর্য  
ii. অজানা আনন্দ  
iii. অপার বিশ্বয়
- কোনটি সঠিক ?
- ক. i ও ii                                      খ. ii ও iii  
গ. i ও iii                                    ঘ. i, ii ও iii

উদ্দীপকটি পড়ে ও ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :  
সেখা হয় নাই চন্দ্র মেলিয়া  
ঘর হতে তধু দুই পা ফেলিয়া  
একটি ধানের শীষের উপরে  
একটি শিশির বিন্দু।

৩. উদ্দীপকের সঙ্গে 'নতুন দেশ' কবিতার কোন দিকটি সাদৃশ্যপূর্ণ ?  
ক. সীমাহীন কৌতুহল  
খ. প্রকৃতির রহস্য  
গ. অজানাকে জানা  
ঘ. অপার আকাঙ্ক্ষা
৪. উক্ত দিকটি 'নতুন দেশ' কবিতার কোন অংশে প্রতিফলিত হয়েছে ?  
ক. জামি না কোন্ দেশে / পৌঁছে যাব শেষে  
খ. থাকি ঘরের কোণে / সাথ জাশে মোর মনে  
গ. পাহাড়-হুড়া সাজে / নীল আকাশের মাঝে  
ঘ. দূর সাগরের পারে / জলের ধারে ধারে

## সুজনশীল প্রশ্ন

১. শীতের ছুটিতে বাবা-মায়ের সঙ্গে ছদ্মতা বেড়াতে যার সেন্টমার্টিন ঘীশে। সেখানকার সামুদ্রিক প্রবাল, সারি সারি নারকেল গাছ, মাছ ধরার বড় বড় নৌকা গুর মনে কৌতুহল জাগায়। দিশন্ত বিকৃত নীলাভ জলরাশি, পরিষ্কার আকাশ গুকে নিয়ে যায় অন্য এক জগতে। গুর ইচ্ছে হয় সমুদ্রের নানা রঙের মাছের সঙ্গে খেলা করতে - আবার কখনো বা আকাশে পাখি হয়ে উড়ে বেড়াতে।  
ক. নীল আকাশের মাঝে কী সাজে?  
খ. 'থাকি ঘরের কোণে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?  
গ. ছদ্মতার সেন্টমার্টিনে সেখা দৃশ্যে 'নতুন দেশ' কবিতায় চিত্রিত কোন দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. "উদ্দীপকটি যেন 'নতুন দেশ' কবিতার মূলভাবকে ধারণ করে আছে।" - উক্তিটির যথার্থতা মূল্যায়ন কর।



## কুলি-মজুর কাঙ্গী নজরুল ইসলাম

দেখিনু সে দিন রেল,  
কুলি বলে এক বাবু সাব তারে রৈলে দিলে দিচ্চে কেনে!  
চোখ কেটে এল জল,  
এমনি করে কি জগৎ ছুড়িয়া যার থাকে দুর্বল?

বে দবাতিসের হাড় দিয়ে ঐ বাম্প-শকট চলে,  
বাবু সাব এসে ঢুকিল তাহাতে, কুলিয়া পড়িল কলে।  
বেতন দিয়াছ? — চূর্ণ রক্ত বত মিথ্যাবাদীর দল!  
কত পাই দিলে কুলিসের তুই কত ফোর পেলি বল!  
রাজপথে তব চলিছে মোটর, সাপরে জাহাজ চলে,  
রেলপথে চলে বাম্প-শকট, দেশ ছেড়ে গেল কলে,  
বল জো এসব কাহাসের দাম! তোমার অট্টালিকা  
কর খুনে রাঙা? — হুঁশ খুলে সেখ, এতি ইটে আছে লিখা।  
তুমি জান নাকো, কিন্তু পাখের এতি খুলিকণা জানে  
ঐ পথ, ঐ জাহাজ, শকট, অট্টালিকার মানে।

আসিতেছে ততদিন,  
দিনে দিনে বহু ব্যক্তিরূপে সেনা, ভবিতে হইবে ধপ!  
হাফুজি শাকল পীহিতি চালায়ে তাকিল যারা পাহাড়,  
পাহাড়-কটা সে পথের দু-পাশে পড়িয়া যাসের হাড়,  
তোমারে সেবিতে হইল যাহারা মজুর, বুটে ও কুলি,  
তোমারে বহিতে যারা পরিব্রাজনে লাগাল হুঁসি;  
ভারাই মানুষ, ভারাই সেবতা, গাই তাহাদেরি গান,  
তাদেরি ব্যথিত বকে পা কেনে আসে দব উত্থান।

(সংক্ষেপিত)

## শব্দার্থ ও টীকা

দযীতি	-	ভারতীয় পুরাণে উল্লেখিত একজন ত্যাগী যুনি। এ কবিতায় শ্রমজীবী কুশি-মজুরদের দযীতিযুনির সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। যে শ্রমজীবী মানুষেরা সভ্যতার বিস্তারে শ্রম দিয়ে সাহায্য করেছেন তারাই আজ অবহেলিত। তাদের শ্রমের ওপর ভর করে যারা ধনী হয়েছেন, তাঁরাই সকল সুবিধাভোগী। কবি দুঃখ করে ত্যাগী দযীতির সঙ্গে ত্যাগী কুশি-মজুরের তুলনা করেছেন।
বাম্প-শকট	-	‘শকট’ মানে গাড়ি। বাম্প-শকট হচ্ছে বাম্প দ্বারা চালিত গাড়ি। এখানে রেলগাড়ি।
পাই	-	মুদুর একক বিশেষ। এ কবিতায় ‘পাই’ বলতে কুশি-মজুরদের মজুরির ‘মজুতা’ বোঝানো হয়েছে।
ক্রোর	-	কোটি।
ঠুপি	-	চোখের ওপর ঢাকনি। গুরুত্ব স্বন্দ ঘানিতে জোড়া হতো, তখন তার চোখে ঢাকনি পরানো হতো। ঐ ঢাকনির নাম ‘ঠুপি’। ‘ঠুপি খুলে’ মানে সচেতন হয়ে।
অট্টালিকা	-	প্রাসাদ, অন্য কথায় সুউচ্চ দালান বা ইমারত।
‘দিনে দিনে বহু বাড়িয়াছে সেনা’	-	অতীতকাল থেকে মানব সভ্যতা শ্রমজীবী মানুষদের অবদানে অগ্রসর হয়েছে, কিন্তু প্রতিদিনে তাঁরা পেয়েছেন অল্পই।
শাবল	-	লোহার তৈরি মাটি বোড়ার হাতিয়ার।
গাঁইতি	-	পাথর, ইউ প্রভৃতি দ্বারা নির্মিত কঠিন স্থান বোড়ার জন্য লালসের আকারের দুমুখো কুড়াল।
বকে	-	বুকে।
নব উত্থান	-	কোনো ভালো কাজের জন্য নতুন করে উদ্যোগী হওয়া।

## পাঠের উদ্দেশ্য

বিভিন্ন পেশার শ্রমজীবী মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাভাষা জ্ঞাপ্ত করা।

## পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি কাজী নজরুল ইসলামের ‘সাম্যবাদী’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। ‘কুশি-মজুর’ কবিতায় কবি মানবসভ্যতার বর্ধারূপকার শ্রমজীবী মানুষের অধিকারের পক্ষে কলম ধরেছেন।

যুগ যুগ ধরে কুশি-মজুরের মতো লক্ষকোটি শ্রমজীবী মানুষের হাতে গড়ে উঠেছে মানবসভ্যতা। এদেরই অক্লান্ত শ্রমে ও ঘামে মোড়ির, জাহাজ, রেলগাড়ি চলছে। গড়ে উঠেছে দালানকোঠা, কলকারখানা। এদের শোষণ করেই ধনিকশ্রেণি হয়েছে বিত্ত-সম্পদের মালিক। কিন্তু যুগ যুগ ধরে সমাজে এই কুশি-মজুররাই সবচেয়ে বঞ্চিত ও উপেক্ষিত। এক শ্রেণির হীনবল মানুষ এদের শ্রমের বিনিময়ে পাওয়া বিত্ত-সম্পদের সবটুকুই ভোগ করছে অথচ এদের তারা মানুষ হিসেবে গণ্য করতেও নারাজ।

### লেখক-পরিচিতি

অন্যায়, শোষণ ও নির্ধাতনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, বিপ্লব ও দেশপ্রেমের উদ্দীপনাময় কবিতা লিখে বাংলার জনমনে বিনি বিদ্রোহী কবি হিসেবে নশিত আসন পেয়েছেন, তিনি কবি কাজী নজরুল ইসলাম।

বহু বিচিত্র ও বিস্ময়কর তাঁর জীবন। ছেলেবেলায় লেটোর দলে পান করেছেন, কুটির দোকানের কারিগর হয়েছেন, সেনাবাহিনীর হাবিলদার হয়ে যুদ্ধে যোগ দিয়েছেন, ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে রাজদ্রোহের অপরাধে কারাবরণ করেছেন। তিনি পত্রিকাও সম্পাদনা করেছেন। কবিতা, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, সঙ্গীত প্রভৃতি ক্ষেত্রে তিনি উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

তিনি যে শুধু বড়দের জন্য লিখেছেন তা নয়, ছোটদের জন্য দেখা তাঁর কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে — ‘কিন্ডেবুল’, ‘সঙ্কলন’, ‘পিলে পটকা’, ‘খুম জাগানো পাখি’, ‘খুম পাড়ানি মাসিপিনি’ এবং নাটক ‘পুতুলের বিয়ে’।

নজরুলের কবিতা ও গান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। তাঁর রচিত ‘সন্ধ্যা’ গ্রন্থের অন্তর্গত ‘চল চল চল’ গানটি আমাদের রণ-সংগীত। তিনি বাংলাদেশের জাতীয় কবি।

নজরুলের জন্ম ১৮৯৯ খ্রিষ্টাব্দের ২৪এ মে (১৩০৬ বঙ্গাব্দের ১১ই জ্যৈষ্ঠ) বর্ধমান জেলার আসানসোল মহকুমার চুকলিয়া গ্রামে।

তিনি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দের ২৯এ আগস্ট (১৩৮৩ বঙ্গাব্দের ১২ই ভাদ্র) ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার দেখা বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের একটি তালিকা প্রণয়ন কর (দলীয় কাজ)।
- খ. তোমার দেখা একজন শ্রমজীবী মানুষের জীবন-যাপনের উপর একটি বিবরণী লেখ (একক কাজ)।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কাজী নজরুল ইসলামের মতে কোনটিতে বেশ ছেয়ে গেল?
  - ক. মেটিরে
  - খ. জাহাজে
  - গ. কলে
  - ঘ. রেলপাড়িতে
২. ‘কুপি-মজুর’ কবিতায় কবি শ্রমজীবীদের জয়গান পেয়েছেন কারণ তারা —
  - i. অবহেলিত
  - ii. সভ্যতার নির্মাতা
  - iii. অধিকারবঞ্চিত

নিচের কোনটি সঠিক?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

বর্ষর বলি যাহাদের গালি গাড়িল ক্ষুদ্রমনা,  
কূলমত্ক 'অসবেযীর' আখ্যা দিয়াছে যারে,  
তারি তরে ভাই গান রচে যাই, বন্দনা করি তারে।

৩. কবিতাংশের 'ক্ষুদ্রমনা' কুলি-মজুর কবিতায় বর্ণিত কোন অংশের প্রতিনিধিত্ব করে ?

- |               |                  |
|---------------|------------------|
| ক. বাবুলাবদের | খ. মিথ্যাবাদীদের |
| গ. দখীতিদের   | ঘ. কুলি-মজুরদের  |

৪. কবিতাংশের মূলভাব 'কুলি-মজুর কবিতার' নিচের কোন চরণে প্রতিফলিত হয়েছে ?

- |   |
|---|
| ক. দিনে দিনে বাড়িয়াছে সেনা, শুধিতে হইবে ঋণ  |
| খ. তারাই মানুষ, তারাই দেবতা, গাহি তাহাদের গান |
| গ. তাদেরই ব্যথিত বক্ষে পা ফেলে আসে নব উত্থান  |
| ঘ. তোমারে বহিতে যারা পবির অঙ্গে লাগলে ধূলি    |

### সুজনশীল প্রশ্ন

১। চেরারম্যান আজমল সাহেবের এলাকায় একজন ভালো মানুষ হিসেবে যথেষ্ট সুনাম রয়েছে, কিন্তু তার ছেলে কারণে-অকারণে বাড়ির কাজের লোক, আপে-পাশের খেটে খাওয়া মানুষের সাথে খারাপ আচরণ করে, তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করে। চেরারম্যান ছেলেকে ডেকে বুঝিয়ে বলেন, তুমি যাদের আজ তুচ্ছ জান করছ — সত্যিকার অর্থে তারাই আধুনিক সভ্যতার নির্মাতা, তাদের কারণেই আমরা সুন্দর জীবন যাপন করছি।

ক. 'কুলি-মজুর' কবিতায় রেলপথে কোনটি চলে?

খ. 'শুধিতে হইবে ঋণ' — কথাটির দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?

গ. চেরারম্যান সাহেবের ছেলের আচরণে 'কুলি-মজুর' কবিতার কোন দিকটি প্রকাশ পেয়েছে — ব্যাখ্যা কর।

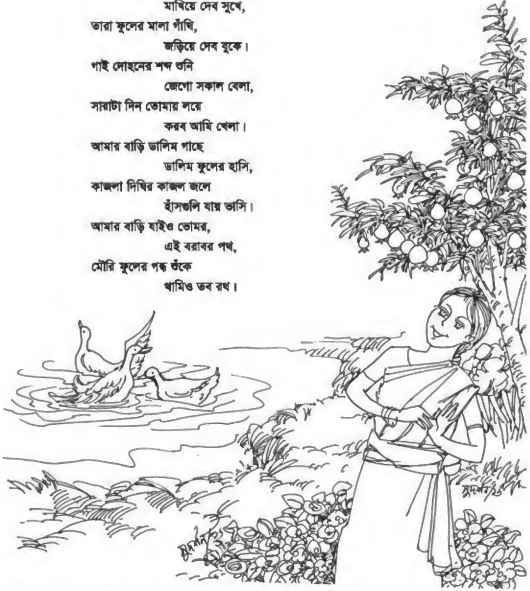
ঘ. 'চেরারম্যান সাহেবের মনোভাব 'কুলি-মজুর' কবিতার মূলভাবেরই প্রতিফলন' — বিশ্লেষণ কর।



## আমার বাড়ি জসীম উদ্দীন

আমার বাড়ি বাঁহিও ভোমর,  
বসতে দেব সিঁড়ে,  
জলপান যে করতে দেব  
শাপি ধানের চিড়ে।  
শাপি ধানের চিড়ে দেব,  
বিল্লি ধানের খই,  
বাড়ির গাছের কবরী কলা,  
গামছা-বাঁধা দই।  
আম-কাঁঠালের বনের ধারে  
শুরো আঁচল পাতি,  
গাছের শাখা দুশিড়ে বাতাস  
করব সান্না হাতি।

চাঁদমুখে তোর চাঁদের চুমো  
 মাথিয়ে দেব সুখে,  
 তারা ফুলের মালা গাঁথি,  
 জড়িয়ে দেব বুকে।  
 গাই দোহনের শব্দ তনি  
 জেগো সকাল বেলা,  
 সারাটা দিন তোমার সরে  
 করব আমি খেলা।  
 আমার বাড়ি ডালিম গাছে  
 ডালিম ফুলের হাসি,  
 কাজলা দিঘির কাজল জলে  
 হাঁসজলি যায় ভাসি।  
 আমার বাড়ি হাইও ভোমর,  
 এই বরাবর পথ,  
 মৌরি ফুলের গন্ধ তঁকে  
 ধামিও তব রথ।



### শব্দার্থ ও টীকা

- ভোমর — মৌমাছি। অমরের কণ্ঠ্য রূপ ভোমর। কবিতাটিতে কোনো বস্তু বা প্রিয়জনকে ভোমর বলে  
 সন্বেখন করে নিজের বাড়িতে আসার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে।
- শালি ধান — এক প্রকার আমন ধান, যা হেমন্তকালে উৎপন্ন হয়।





কবিতাপ্রতি পড়ে ও ও নবর প্রপ্নের উত্তর দাও :

আর হেলেরা আর মেরেরা  
ফুল তুলিতে যাই —  
ফুলের মালা গলায় দিয়ে  
মামার বাড়ি যাই

কড়ের দিনে মামার দেশে  
আম কুড়াতে সুখ,  
পাকা জামের মথুর রসে  
রঙিন করি মুখ।

৩. উদ্ধৃতির প্রথম স্তবকের সাথে নিচের কোন চরণ/চরণসমূহে মিল লক্ষ করা যায়-

- i. আমার বাড়ি যাইও ভোমর / বসতে দেব পিড়ে।
- ii. পাছের পাতা দুপিয়ে বাতাস / করব সারা হাতি।
- iii. তারা ফুলের মালা গাঁধি / জড়িয়ে সেব বুকে।

কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উদ্ধৃতির দ্বিতীয় স্তবকের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার মিল কোথায় ?

- |                   |               |
|-------------------|---------------|
| ক. প্রকৃতিতে      | খ. নিমন্ত্রণে |
| গ. বাদ্য-বর্ণনায় | ঘ. বহুত্বে    |

#### সৃজনশীল প্রশ্ন

১. তুমি যাবে ভাই — যাবে মোর সাথে, আমাদের ছোট গাঁয়,  
পাছের ছায়ায় লতায় পাতায় উদাসী বনের বায়,  
মায়া মমতায় জড়াজড়ি করি  
মোর দেহখানি রহিয়াছে ভরি  
মায়ের বুকেতে, বোনের আদরে, ভাইয়ের দ্বৈতের ছায়।

- ক. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কাজলা দীখির কাজল জলে কী হাসে?
- খ. 'আমার বাড়ি' কবিতায় কবি বহুকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন কেন?
- গ. উদ্দীপকের প্রথম চরণের সাথে 'আমার বাড়ি' কবিতার কোন অংশের মিল আছে? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদ্দীপক ও 'আমার বাড়ি' কবিতার ভাবার্থ কি এক? বিশ্লেষণ কর।



## শোন একটি মুজিবরের থেকে গৌরীশঙ্গম মজুমদার

শোন একটি মুজিবরের থেকে  
লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি-প্রতিধ্বনি  
আকাশে বাতাসে ওঠে রনি  
বাংলাদেশ, আমার বাংলাদেশ।।

সেই সবুজের বুক চেরা মেট্রোপথে  
আবার যে যাব ফিরে, আমার  
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব  
শিল্পে-কাব্যে কোথায় আছে  
হারেরে এমন সোনার ধনি।।

বিশ্বকবির 'সোনার বাংলা'  
নজরুলের 'বাংলাদেশ'  
জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'  
রূপের যে ডার নেই কো শেষ, বাংলাদেশ।

'জয় বাংলা' বলতে মনরে আমার  
এখনো কেন ভাব, আমার  
হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব  
অন্ধকারে পূব আকাশে  
উঠবে আবার দিনমণি।।

### শব্দার্থ ও টীকা

- 'একটি মুজিবর' — 'একজন মুজিব'। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ছিলেন স্বাধীনতাকামী বাঙালি জাতির আশা-ভরসার একক আধার ছিল।
- 'লক্ষ মুজিবরের কণ্ঠস্বরের ধ্বনি' — একাত্তরে বঙ্গবন্ধুর বক্তৃকণ্ঠে 'স্বাধীনতা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেন লক্ষ বাঙালির মিলিত কণ্ঠস্বর স্বাধীনতার জন্য গর্জে উঠেছিল।
- 'হারানো বাংলাকে আবার তো ফিরে পাব' — একসময় এই বাংলা ছিল স্বাধীন জনপদ। ১৭৫৭ সালে তা বৃটিশদের কাছে স্বাধীনতা হারায়। পরবর্তীতে ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগে এই দেশ - পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হলে বিভক্ত পূর্ববাংলা পরিস্থিতি পায় পূর্ব পাকিস্তান নামে। পাকিস্তানের ২৩ বছরের চাপিয়ে দেয়া দুশাসনে বাঙালি একে একে হারাতে বসে সব অধিকার। মহান মুক্তিযুদ্ধে কাল্পিত

বিজয়ের মাধ্যমে সেই হারানো স্বাধীন পূর্ব বাংলাকে ফিরে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষা প্রকাশিত হয়েছে।

বিশ্বকবি

‘সোনার বাংলা’ — বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর রচিত একটি দেশাত্মবোধক গানে এই দেশকে ‘সোনার বাংলা’ বলে অভিহিত করেছেন – যা আমাদের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃত।

নজরুলের

‘বাংলাদেশ’ — ‘বাংলাদেশ’ শিরোনামের প্রথম কবিতাটি আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের লেখা। তাঁর কবিতা, সংগীত ও প্রবন্ধে বাংলা ও বাঙালির মুক্তির কথা উচ্চারিত হয়েছে বারবার। মহান মুক্তিযুদ্ধে নজরুলের উদীপনামূলক লেখাপুঁথো ছিল আমাদের অতীতের ধ্রুপদ উদ্দেশ্য।

জীবনানন্দের

‘রূপসী বাংলা’ — নিঃসর্গের কবি জীবনানন্দ দাশ বাংলার প্রকৃতির অনিন্দ্য রূপ সৌন্দর্য চিরায়ত মহিমায় উপস্থাপন করেছেন তাঁর ‘রূপসী বাংলা’ কাব্যগ্রন্থে।

‘জয় বাংলা

বলেতে.....ভাব’ — পাকিস্তান বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে ‘জয় বাংলা’ শ্লোগানেই প্রকাশিত হতো সারা দেশ। জয় সুনিশ্চিত ও অবশ্যম্ভাবী জেনে বিধাহীন চিন্তে এই একটি শ্লোগানেই সংযুক্ত হয়েছিল সমগ্র বাঙালি জাতি।

## পার্শ্ব উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীদের বসবস্তু ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় উদ্বুদ্ধ করা।

## পার্শ্ব-পরিচিতি

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের শুরুর দিকে পৌরীজসঙ্গ মজুমদারের লেখা আলোড়ন সৃষ্টিকারী এই গানটি অন্যান্য গানের সাথে বারবার বাজানো হতো স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে। গানটির সুরকার ও শিল্পী ছিলেন বিখ্যাত লোকসঙ্গীত শিল্পী অশুমান রায়। অসামান্য জনপ্রিয় হওয়ার পর পৌরীজসঙ্গ নিজেই এই গানটিকে ‘The voice of not one, but million mujibors singing’ শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করেন যা, পেয়েছিলেন শিল্পী কবীর নাথ।

১৯৭১ সালের ২৫এ মার্চের কালরাত্রে এই দেশে হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী নির্বিচারে বাঙালি জনগণের উপর হত্যাযজ্ঞের সূচনা করলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬এ মার্চের প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। এরপরই তাকে হেফত করে পাকিস্তানের কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। তার আহ্বানে সাড়া দিয়ে লক্ষ লক্ষ মানুষ মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়ে পড়ে। এর আগে ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন ‘এবারের সংগ্রাম, স্বাধীনতার সংগ্রাম’। তাঁর বক্তৃচ্চের আহ্বান ঐ মুহূর্তেই সমগ্র বাংলার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছিল। মুক্তিযুদ্ধের দীর্ঘ নয় মাস কারাগারে বন্দি থাকলেও তাঁর স্বাধীনতার ডাক কোটি বাঙালির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়ে বেজেছে চারদিকে। পাকিস্তান-বিরোধী সকল সংগ্রাম-আন্দোলনে সারা দেশেই প্রচার করা হতো তাঁর ভাষণ-বক্তৃতা। মুক্তিযোদ্ধাসহ স্বাধীনতাকামী সকল মানুষের রক্ত-চেতনায় তা প্রবোধনা জাগাতো।

### কবি-পরিচিতি

আধুনিক বাংলা গানের স্বর্ণযুগের কিংবদন্তি গীতিকার গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার (জন্ম: ১৯২৪ - মৃত্যু: ১৯৮৬) এর আদি পৈতৃক নিবাস পাবনা জেলায়। ‘কফি হাউসের সেই আড্ডাটা’, ‘ও নদীরে’, ‘নিশিরাত বাঁকা ঠান’, ‘মঙ্গল দীপ ছেলে’, ‘বদি হিমালয়-আজকের’, ‘ও পলাশ ও শিমুল’, ‘আকাশ কেন ডাকে’ সহ তার লেখা অসংখ্য গান আমাদের সঙ্গীত জগতের চিরায়ত সম্পদ বলে ইতিহাসে স্থান করে নিয়েছে। তাঁর রচিত বেশ কয়েকটি গান যেমন ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’, ‘আমরা সবাই বাঙালি’, ‘মাগো ভাবনা কেন’, ‘পথের ক্রান্তি ছুঁলে’ – ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় এ দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষকে অস্ত্রহীন স্রোতা বুগিয়েছিল।

১৯৭২ সালে বঙ্গবন্ধুর আমন্ত্রণে তিনি রত্নায় অতিথি হিসেবে বাংলাদেশে এসেছিলেন। মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়াত গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারকে ‘মুক্তিযুদ্ধ মৈত্রী সন্মাননা’ জানানো হয় ২০১২ সালে।

### কর্ম-অনুশীলন

ক. বঙ্গবন্ধুর জীবন ও কর্ম অবলম্বনে দেয়ালপত্রিকা প্রকাশ কর। [দলীয় কাজ]

খ. শিল্পী, গীতিকার ও সুরকারের নাম উল্লেখসহ ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে প্রচারিত উদ্দীপনামূলক গানভঙ্গীর একটি তালিকা তৈরি কর।

### নমুনা প্রশ্ন

#### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- সেই সবুজের বুক চেরা পথটি কেমন?
 

ক. পাকা	খ. মেটো
গ. ভাঙ্গা	ঘ. গ্রাম্য
- কোন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্বের জন্য বাংলাকে ‘সোনার বনি’ বলা হয়েছে?
 

ক. লড়াই-সমগ্রায়	খ. শিল্প-কাব্য
গ. সঙ্গীত	ঘ. জীভূতশৈলী

উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

জীবননানের প্রতিজ্ঞা লয়ে লক্ষ সেনা পাছে

তোমার হুকুম তামিলের লাগি সাথে তব চলিয়াছে।

- কবিতাঘোষের ‘তোমার হুকুম’ ‘শোন একটি মুজিবরের থেকে’ কবিতার কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?
 

ক. গৌরীপ্রসন্ন মজুমদার
খ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
গ. কাজী নজরুল ইসলাম
ঘ. জীবনানন্দ দাশ

৪. উপর্যুক্ত সাদৃশ্যের কারণ, তিনি-

- i. বাঙালির জাতির পিতা
- ii. স্বাধীনতার স্বপ্ন-দিশারী
- iii. বাঙালির অবিসংবাদিত নেতা

কোনটি সঠিক ?

- |            |                |
|------------|----------------|
| ক. i ও ii  | খ. ii ও iii    |
| গ. i ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. মুজিবুর রহমান

ওই নামে যেন বিনুতিয়াসের অগ্নি-উগারী বাণ।

বঙ্গদেশের এ প্রান্ত হতে সকল প্রান্ত ছেয়ে

জ্বালায় জ্বলিছে মহাকালালল ঝঞ্চা অশনি বেয়ে।

মায়ের বুকের ভায়ের বুকের বোনের বুকের জ্বালা,

তব সম্মুখে পথে পথে আজ সেখানে চলিছে আলা।

ক. কোন কবির তোখে বাংলাদেশ 'রূপসী বাংলা'?

খ. 'অন্ধকারে পূর্ব আকাশে উঠবে আবার দিনমণি' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. উদ্দীপকের ২য় চরণে 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উদ্দীপকটি 'শোন একটি মুজিবরের থেকে' কবিতার সম্পূর্ণভাবে বহন করে কি? স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

## সবার আমি ছাত্র সুনির্মল বসু

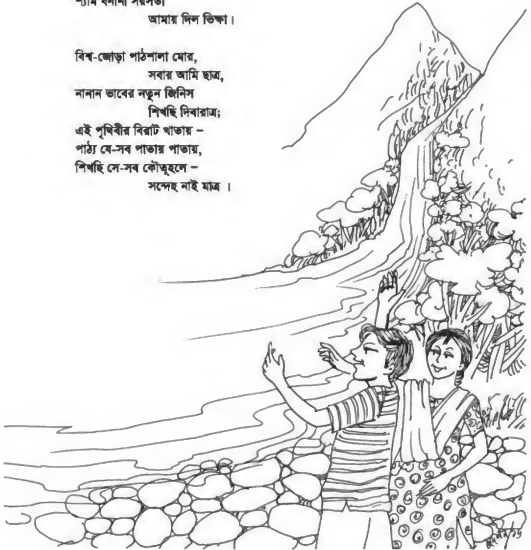
আকাশ আমার শিক্ষা দিল  
উদার হতে তাই রে,  
কর্মী হবার মন্ত্র আমি  
বায়ুর কাছে পাই রে।  
পাহাড় শিখার তাহার সমান  
হই যেন তাই মৌন-মহান,  
খোলা হাঠের উপদেশে -  
দিল-খোলা হই তাই রে।

সূর্য আমার মন্ত্রণা দেয়  
আগুন তেজে জ্বলতে,  
চাঁদ শিখালো হাসতে মিঠে,  
মধুর কথা বলতে।  
ইন্দ্রিতে তার শিখায় সাগর -  
অন্তর হোক রত্ন-আকর;  
নদীর কাছে শিক্ষা পেলাম  
আগুন বেগে চলতে।



মাটির কাছে সহিষ্ণুতা  
 পেলাম আমি শিক্ষা,  
 আপন কাজে কঠোর হতে  
 পাখাখ দিল দীক্ষা ।  
 বরনা জাহ্যর সহজ পানে  
 পান আগালো আমার গ্রাণে,  
 শ্যাম বনানী সরসতা  
 আমার দিল ভিক্ষা ।

বিশ্ব-জোড়া পাঠশালা মোর,  
 সবার আমি ছাত্র,  
 নানান ভাবের নতুন জিনিস  
 শিখছি দিবারাত্র;  
 এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় –  
 পাঠ্য যে-সব পাতায় পাতায়,  
 শিখছি সে-সব কৌতুহলে –  
 সন্দেহ নাই যাত্র ।



### শব্দার্থ ও টীকা

দিল-খোলা	—	মনখোলা, মুক্তমন।
মন্ত্রণা	—	উপদেশ, হুতি-পরামর্শ, স্নেহণা।
সহিষ্ণুতা	—	সহ্য করার ক্ষমতা।
পাখাণ	—	পাখর।
শ্যাম বনানী	—	সবুজ বন।
মৌন-মহান	—	ধৈর্ঘ্যে-ইচ্ছাধৈর্যে পাহাড়ের মতো মৌন বা নীরব এবং ভাষে-কর্ম্যে পাহাড়ের মত সুউচ্চ বা মহান হবার কথা বলা হয়েছে।

### পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীকে সত্যতা ও নৈতিক মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা।

### পাঠ-পরিচিতি

জন্মগতভাবেই বেঁচে থাকার জন্য মানুষ প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। মানবিক ও নৈতিক শিক্ষালাভেও প্রকৃতি সবচেয়ে বড় সহায়ক শক্তি। আকাশের অসীমতা আমাদের উদারতা শেখায়। আমাদের কর্মপ্রেরণার বড় উৎস নিরন্তর বায়ু-প্রবাহ। পাহাড়ের উচ্চতা আমাদের উদারতা শেখায় উৎসাহ জোগায়। আহুত্যাগের আরেকটি বড় উদাহরণ সূর্য। সে তার নিজের আলো দিয়ে সবাইকে আলোকিত করে। সাগর তার বুকে হুগু হুগু ধরে বিশাল রত্নভাণ্ডার সংরক্ষণ করে নীরবে মানবকল্যাণ করে যায়। নদী আমাদের গতিশীল থাকার শিক্ষা দেয়। গতিময় ঝরনা মনকে ভেতর থেকে চলমান রাখতে সাহায্য করে। সবুজ বন আমাদের মনকে রাখে সজীব। মাটি নিজে যেমন সব কিছু সহ্য করতে পারে, তেমনি অন্যদেরও সে সহিষ্ণুতা শিখায়। নিজের সব কাজে দৃঢ় থাকার, পাখরের কাছ থেকে আমরা শিখতে পারি। এভাবে পৃথিবীর সকল বস্তু বা ব্যক্তির কাছ থেকে শিক্ষা নিয়েই আমাদের পথ চলতে হবে।

### কবি পরিচিতি

সুনির্মল বসু ১৯০২ সালে পশ্চিমবঙ্গের বিহারে জন্মগ্রহণ করেন। তার শৈশবক নিবাস ছিল বৃহত্তর ঢাকার বিক্রমপুরে। তিনি ছিলেন কবি ও শিল্পসাহিত্যিক। কবিতা, গল্প কাহিনি, উপন্যাস, ভ্রমণকাহিনি ইত্যাদি বিষয়ে শিল্প ও কিশোর উপযোগী সাহিত্য রচনা করেছেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: ‘হানাবড়া’, ‘বেড়ে মজা’, ‘হেঁচো’, ‘হলছুল’, ‘কথা শেখা’, ‘পাততাকি’ ইত্যাদি। ১৯৫৭ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুশীলন

- নৈতিকতা বিষয়ে আলোচনাচক্র ও বক্তৃতা অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। [দলগত কাজ]
- মানুষের জন্য কল্যাণকর গুণসমূহের একটি তালিকা প্রস্তুত কর।
- তোমার পরিচিত একজন সং ও নিষ্ঠাবান ব্যক্তি সম্পর্কে লেখ।

### নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

- কবিতায় আপন কাজে কঠোর হওয়ার শিক্ষা দেয় কোনটি?
 

ক. পাহাড়	খ. পাখাণ
গ. ঝরনা	ঘ. মাটি



২. 'এই পৃথিবীর বিরাট খাতার' বলতে কী বোঝানো হয়েছে ?

- ক. পৃথিবীতে অজানা বলে কিছু নেই
- খ. পৃথিবীকে বিরাট খাতা বলা হয়েছে
- গ. পৃথিবীর সবকিছুই জ্ঞানের আধার
- ঘ. প্রকৃতি বড় একটি খাতা বিশেষ

৩. যখন মানবকুল ধনবান হয়  
তখন তাদের শির সমুন্নত রয়  
কিন্তু ফলশালী হলে এই তরুণ  
অহংকারে উচ্চ শির না করে কখন

– উদ্দীপকের সাথে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার সঙ্গতিপূর্ণ চরণ –

- i. শ্যাম বনানী সরসতা  
আমায় দিল ভিক্ষা
- ii. মাটির কাছে সহিষ্ণুতা  
পেলায় আমি শিক্ষা
- iii. আকাশ আমার শিক্ষা দিল  
উলার হতে ভাইরে

কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. ii ও iii
- গ. i ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৪. উদ্দীপকে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কোন শিক্ষণীয় দিকটি - ফুটে উঠেছে ?

- ক. নত না হওয়া
- খ. শিক্ষা অর্জন করা
- গ. মিলে মিলে থাকা
- ঘ. উদ্ধত না হওয়া

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. উদ্দীপক ১ম অংশ : হাজার পথে প্রান্তরে পৌত্তপিকের প্রস্তরখারে মহানবী আহত হইয়াছেন, ব্যঙ্গ বিদ্রোপে বারবার উপহাসিত হইয়াছেন; কিন্তু তাহার অন্তর ভেদিয়া একটি মাত্র প্রার্থনার বাণী জাগিয়াছে; – 'এদের জ্ঞান দাও প্রভু, এদের ক্ষমা কর'।

২. উদ্দীপক ২য় অংশ : মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) সবার আদর্শ ও অনুকরণীয়ও বটে। সাদা হাস্যোজ্জ্বল ও মিষ্টভাবী মহানবী সবার কাছে 'মাটির মানুষ'। তাঁর সান্নিধ্যে সবাই যেমন কাজে গতি পেত, তেমনি সবাই তার কাছ থেকে শিখেছিল সুন্দর সুন্দর চিন্তা করতে। আর প্রয়োজনে কঠিন হতেও তিনি পিছপা হতেন না।

ক. কোনটি আমাদেরকে 'দিল খোলা' হওয়ার শিক্ষা দেয়?

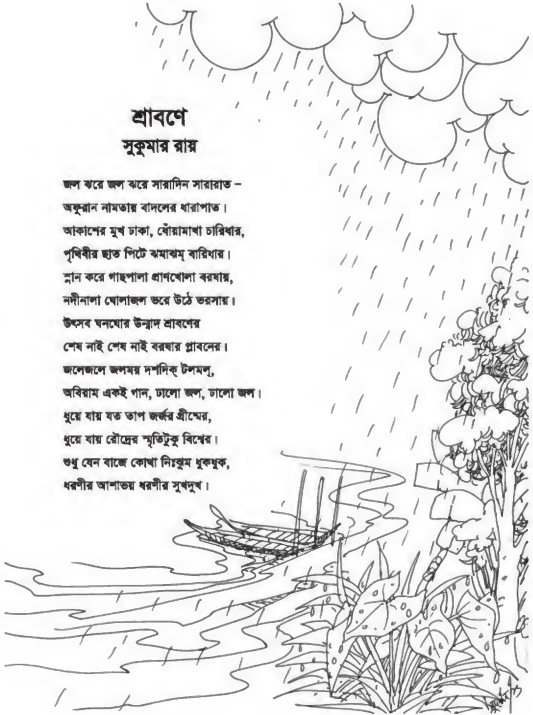
খ. 'সবার আমি ছাত্র' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন?

গ. উদ্দীপকের ১ম অংশে 'সবার আমি ছাত্র' কবিতার কোন অংশের পরিচয় রয়েছে – ব্যাখ্যা কর।

ঘ. মহানবী হযরত মুহম্মদ (স.) এর জীবনাদর্শ যেন মানুষের জন্য 'বিশ্বজোড়া পাঠশালা'র মতই – উদ্দীপক ও কবিতার আলোকে বিশ্লেষণ কর।

## শ্রাবণে সুকুমার রায়

জল করে জল করে সারাদিন সারারাত -  
অফুরান নামডায় বাদলের ধারাপাত ।  
আকাশের মুখ ঢাকা, ঘোয়ামাথা চারিধার,  
পৃথিবীর ছাত পিটে অমায়ম্ বারিধার ।  
নান করে পাছপালা গ্রাণখোলা বরষার,  
নদীনালা খোলাজল ভরে উঠে ভরসার ।  
উৎসব ঘনঘোর উন্মাদ শ্রাবণের  
শেষ নাই শেষ নাই বরষার প্রাবলের ।  
জলেজলে জলময় দশদিক্ টলমল,  
অবিরাম একই পান, ঢালো জল, ঢালো জল ।  
ধুয়ে যায় বত তাপ জর্জর ঝীংঘর,  
ধুয়ে যায় রৌদ্রের স্মৃতিটুকু বিশ্বের ।  
তপ্ত ঘন বাক্সে কোথা নিঃস্রম ধুকধুক,  
ধরণীর আশাতম ধরণীর সুখদুখ ।



## শব্দার্থ ও টীকা

‘অমুরান নামতায়

বাদলের ধারাপাত’ — গণিতে ‘নামতা’ বলতে বোঝায় গুণ করার ধারাবাহিক তালিকা; আর ‘ধারাপাত’ হল অঙ্ক শেখার প্রাথমিক বই। এ কবিতায় বৃত্তিধারার পতনকে বলা হচ্ছে ধারাপাত; বৃত্তির পতনের অবিরাম রিমঝিম ধ্বনি অনেকটা যেন শিতদের নামতা পড়ার শব্দের মতো।

ছাত — ছাদ। ছাদের কথা রূপ ছাত।

বারিধার — জলের ধারা।

উন্মাদ — উন্মত্ত, ক্রিষ্ট। শ্রাবণ মাসে অবিরাম ধারা বর্ষণ ঘটে বলে কবি এখানে শ্রাবণকে ‘উন্মাদ শ্রাবণ’ বলেছেন।

জর্জর — কাতর।

নিঃশুম — নিঃশব্দ, নীরব, নিঃশব্দ।

## পাঠের উদ্দেশ্য

শিকারীদের প্রকৃতি ও পরিবেশ বিষয়ে আকৃষ্ট করে তোলা।

## পাঠ-পরিচিতি

‘শ্রাবণে কবিতা’ সুকুমার রায়ের ‘খাই খাই’ ছড়ারূপের অন্তর্গত। গ্রীষ্মের দাবদাহে জর্জরিত প্রকৃতি অবিরাম বর্ষার স্নান করে সজীব ও প্রাণবন্ত রূপ ধারণ করেছে, কবিতায় সে ছবিই আঁকা হয়েছে। বর্ষার জলে গাছপালা নদী-নালা থেকে তরল করে রুদ্ধ প্রকৃতি মুহূর্তেই জলে পরিপূর্ণ হয়। প্রকৃতিতে প্রাণের সঞ্চারণ ঘটে। গ্রীষ্মকালের রোদের চিহ্ন ধুয়ে মুছে প্রকৃতি এ সময় নতুন রূপ ধারণ করে। এভাবেই কবুর পালাবদলের মতো মানব-মনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখের পালাবদল ঘটে।

## কবি পরিচিতি

শিশু-কিশোর পাঠকদের কাছে সুকুমার রায় একটি প্রিয় নাম। তাঁর আদি পৈত্রিক নিবাস ময়মনসিংহ জেলায়। বাহলা সাহিত্যে তিনি অমর হয়ে আছেন প্রাধানত রসের কবিতা, হাসির গল্প, নাটক ইত্যাদি শিশুতোষ রচনার জন্য। ‘আবোল ভাবোল’, ‘হৃদবরল’, ‘পাগলা দাশু’ প্রভৃতি তার অতুলনীয় রচনা। তাঁর পিতা উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী একজন বিখ্যাত শিশুসাহিত্যিক। কিংবদন্তি চলচ্চিত্র-নির্মাতা ও ন্যাতিমান সাহিত্যিক সত্যজিত রায় তাঁর পুত্র। সুকুমার রায়ের কলকাতায় জন্ম ১৮৮৭ খ্রিষ্টাব্দে এবং মৃত্যু ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে।

## কর্ম-অনুশীলন

ক. শ্রাবণ মাসে জোয়ার এলাকায় কী কী পরিবর্তন ঘটে? লেখ।

খ. বর্ষার গান ও কবিতা নিয়ে একটি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর।

## নমুনা প্রশ্ন

### বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. শ্রাবণের জল অবিরাম করে –

- |                |                |
|----------------|----------------|
| ক. সঙ্গীতের মত | খ. কোলাহলের মত |
| গ. গণিতের মত   | ঘ. নামতার মত   |

২. 'অবিরাম একই গান' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- ক. বর্ষায় প্রাণন
- খ. নদীর খোলাজল
- গ. একটানা বৃষ্টি
- ঘ. সঙ্গীত সন্ধ্যা

৩. বর্ষপমুখর দিনে অরণ্যের কেয়া শিহরায়,  
রৌদ্র-সঙ্ঘ ধানক্ষেত আজ তার স্পর্শ পেতে চায়,  
— উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার যে দিকটির সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ?

- ক. অবিরাম বৃষ্টি
- খ. মেঘলা আকাশ
- গ. বৃষ্টিদ্রাভ প্রকৃতি
- ঘ. তাপ ধুয়ে যাওয়া

৪. 'বৃষ্টি এল কাশবনে জাগল সাড়া ঘাসবনে'  
— উদ্দীপকের ভাবধারা 'শ্রাবণে' কবিতার কোন পর্য্যক্তিতে প্রতিফলিত হয়েছে?

- ক. অফুরান নামতায় বাদলের ধরাপাত
- খ. আকাশের মুখ ঢাকা, ঘোঁয়ামাথা চারিধার
- গ. ত্রান করে গাছপালা প্রাণখোলা বরষার
- ঘ. নদীনালা খোলাজল তরে উঠে ভরসায়

### সুজনশীল প্রশ্ন

উদ্দীপক (১) আজিকার রোদ দুমারে পড়িছে— খোলাটে মেঘের আড়ত,  
কেয়া বন পথে স্বপন বুনিছে— ছল ছল জলবারে।  
কাহার খিয়ারী কদম শাখে— নিম্বুঝুম নিরলায়,  
ছোট ছোট রেখু হুলিয়া দিয়াছে— অন্ধুট কলিকায়।

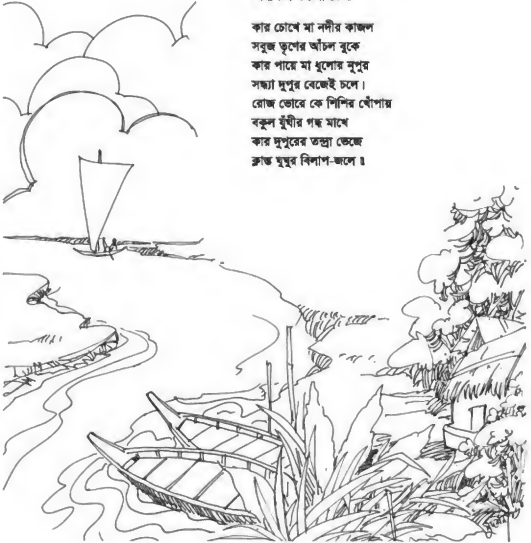
উদ্দীপক (২) কেউবা রঙিন কাঁধায় মেলিয়া বুকের স্বপনখানি,  
তারে ভাষা দেয় দীঘল স্তার ময়াদাৰী আখর টানি।

- ক. প্রাণখোলা বর্ষায় কে ত্রান করে?
- খ. 'উন্মাদ শ্রাবণ' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?
- গ. ১ম উদ্দীপকে 'শ্রাবণে' কবিতায় বর্ণিত বর্ষার কোন দিকটি চিত্রিত হয়েছে? বর্ণনা কর।
- ঘ. ২য় উদ্দীপকটি 'শ্রাবণে' কবিতার শেষ চরণে প্রতিফলিত হয়েছে কি?— যুক্তিসহ বিচার কর।

## গরবিনী মা-জননী সিকান্দার আবু জাফর

ওরে আমার মা-জননী  
জননুত্বি বাড়লারে  
তোর মত আর পুণ্যবতী  
ভাগ্যবতী বল মা কে ।

কার চোখে মা নদীর কাজল  
সবুজ তৃণের আঁচল বুকে  
কার পারে মা খুলোর নুপুর  
সন্ধ্যা দুপুর বেজেই চলে ।  
রোজ ভোরে কে শিশির বোঁপার  
বকুল ফুঁয়ার গন্ধ মাখে  
কার দুপুরের তপ্তা ভেজে  
ক্লান্ত হৃদয় বিলাপ-জলে ।

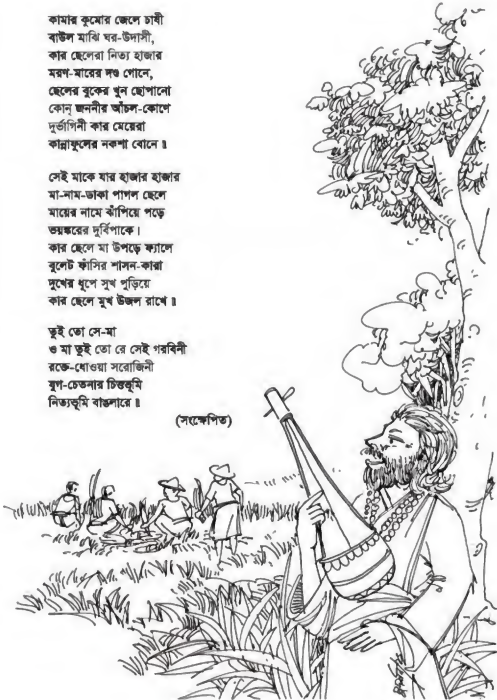


কামার কুমোর জেলে চাষী  
বাউল মাঝি ঘর-উদাসী,  
কার ছেলেরা নিত্য হাজার  
মরণ-মারের লও গোনে,  
ছেলের বুকের খুন ছোঁপানো  
কোন জননীর আঁচল-কোণে  
দুর্ভাগিনী কার মেয়েরা  
কান্নাফুলের নকশা বোনে ॥

সেই মাকে যার হাজার হাজার  
মা-নাম-ভাবা পাগল ছেলে  
মায়ের নামে কাঁপিয়ে পড়ে  
ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকের ।  
কার ছেলে মা উপড়ে ক্যালে  
বুলেট ফাঁসির শাসন-কারা  
দুখের ধূসে সুখ পুড়িয়ে  
কার ছেলে সুখ উজল রাখে ॥

তুই তো সে-মা  
ও মা তুই তো রে সেই গরবিনী  
রক্ত-ধোওয়া সরোজিনী  
যুগ-চেতনার চিত্তকুহি  
নিত্যকুহি বাঁতলারে ॥

(সংক্ষেপিত)



## শব্দার্থ ও টীকা

পুণ্যবতী	— পুণ্য বা ভাঙ্গো কাজ করেন এমন নারী।
সরোজিনী	— সরোজ মানে পদ্ম – সরোজের স্ত্রীবাচক রূপ সরোজিনী। এ কবিতার দেশমাতৃকা বাংলাকে তুলনা করা হয়েছে কমলীয় পদ্মের সঙ্গে।
‘মরণ-মারের দণ্ড’	— মরণের আঘাত থেকে প্রাপ্ত শাস্তি।
ছোপানো	— ছোপ মানে ছাপ, রঙ। এখানে ছোপানো মানে রাঙানো।
পাগল ছেলে	— বাংলার মুক্তিকামী বিদ্রোহী ও তরুণ-যুবকেরাই ‘পাগল ছেলে’ – বারা নির্ভয়ে যুদ্ধে-সম্মুখীন লিপ্ত হয়েছিল।
‘ভয়ঙ্করের দুর্বিপাকে’	— ভীতিকর দুর্বোপ ও দুর্ঘটনা। এখানে ভয়াবহ ও রক্তক্ষয়ী যুদ্ধকে বোঝানো হয়েছে।
শাসন-কারা	— পাকিস্তানি দুশাসন – যা ছিল কারাগারে সমান।
উজল	— উজ্জ্বল শব্দটির কোমল রূপ।
‘হৃৎ-চেতনার তিত্তভূমি / নিত্যভূমি বাতলারে’	— হৃদের আকাজককে ধারণ করা চিরন্তন দেশমাতৃকা বাংলাদেশ।

## পাঠের উদ্দেশ্য

শিক্ষার্থীর মধ্যে ‘দেশ চেতনার বহিঃপ্রকাশ’ ঘটবে।

## পাঠ-পরিচিতি

কবিতাটি ‘বাঙলা ছাড়া’ কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। উপর্যুক্ত কবিতাটিতে পুণ্যবতী ভাণ্যবতী দেশমাতার গর্ভিত হয়ে ওঠার কারণ অন্বেষণ করা হয়েছে। বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক জীবনের সঙ্গে পরিবেশ-প্রকৃতির সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। শ্রমজীবী, কৃষিজীবী থেকে শুরু করে সব পেশাজীবী সন্তান এই মায়ের কোল জুড়ে থাকে। এই মাকে রক্ষা করার জন্য এই সন্তানেরা শত কষ্ট সহ্য করে, তবে কোন অন্যায়, অত্যাচার, অবিচারকে তারা মেনে নিতে পারে না। মাকে বাঁচানোর জন্য প্রয়োজনে তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিতেও দ্বিধা করে না। আবার এই মাকেও সন্তানের জন্য বিশেষ ভূমিকা রাখতে হয়। সন্তানকে সাহস ও শক্তি যোগাতে হয়। দেশমাতৃকাকে সকল দুশাসন থেকে রক্ষার জন্য মায়ের সন্তানেরা ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারা যে কোনো দুসময়ের জেল জুলুম কাঁসির দণ্ড মাথার নিয়ে নিজের সুখ শান্তি ও আলস্য পরিহার করে দেশের জন্য আত্মত্যাগ করতে দ্বিধা করে না। হৃদের দাবি ও সময়ের দাবি রক্ষায় যে সন্তানরা সাহসের সাথে সম্মুখের পথ বেছে নেয়, তাদের জন্য বাংলাদেশ সত্যিই গর্ভিত। প্রকৃতপক্ষে বাংলার মাটি এই সাহসী ও সম্মুখী জনতার তিত্তভূমি।

## কবি-পরিচিতি

সিকান্দার আবু জাফর বাংলাদেশের একজন বিশিষ্ট কবি, নাট্যকার ও সাংবাদিক। জন্মেছেন সাতক্ষীরা জেলায়। জন্মসাল ১৯১৯ খ্রিষ্টাব্দ। পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। ‘হাসন গ্রহর’, ‘তিমিরাজিক’, ‘বাঙলা ছাড়া’ প্রকৃতি তাঁর কাব্যগ্রন্থ। ‘সিরাজ-উ-দৌল’ তাঁর বিখ্যাত নাটক। তিনি মৃত্যুবরণ করেন ১৯৭৫ সালে।

## কর্ম-অনুশীলন

ক. দেশস্নেহমূলক কবিতা আবৃত্তি অনুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলগত কাজ)

খ. পূর্ববর্তী কোন শ্রেণিতে পড়া তোমার ভাললাগা কোন ‘দেশস্নেহ’ের কবিতা সখকে তোমার অনুভূতি লেখ।

## নমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. মারের আঁচল কোশে কী লেগে আছে?
 

ক. বকুল মূখীর গন্ধ	খ. কান্না ফুলের নকশা
গ. ছেলের বুকের খুন	ঘ. সবুজ তৃণ
২. 'পরবিনী মা-জননী' কবিতায় 'দুর্ভাগিনী মেয়ে' বলে কাদের বোঝানো হয়েছে?
 

ক. বাংলার অবহেলিত মেয়েদের	খ. বাংলার গ্রামীণ মেয়েদের
গ. দুর্ভাগ্য জর্জরিত মেয়েদের	ঘ. বুড়ে ক্ষতিগ্রস্ত মেয়েদের
৩. আমরা অপমান সইব না  
 তীরুর মত ঘরের কোণে রইব না  
 আমরা আকাশ হতে বজ্র হয়ে ঝরতে জাতি  
 তোমার ভয় নেই মা  
 আমরা প্রতিবাদ করতে জাতি।  
 উদ্দীপকের চেতনা নিচের যে চরণে বিদ্যমান —
 

ক. কার ছেলেরা নিত্য হাজার মরণ মারের দণ্ড গোপে	খ. ছেলের বুকের খুন ছোপানো কোন জননীর আঁচল কোশে
গ. মারের নামে ঝাঁপিয়ে পড়ে ভয়ঙ্করের দুর্ভিশাকে	ঘ. দুখের ধূপে সুখ পুড়িয়ে কার ছেলে মুখ উজল রাখে
- ৪। এক সাগরের রক্তের বিনিময়ে  
 বাংলার স্বাধীনতা আনল যারা  
 আমরা তোমাদের ভুলবনা।  
 — উদ্দীপকে 'পরবিনী মা জননী' কবিতায় উল্লিখিত বাঙালি সন্তানের কোন সিকটির প্রতিফলন ঘটেছে?  

ক. সঙ্গ্রামের	খ. পর্বের
গ. প্রতিবাদের	ঘ. আত্মত্যাগের



### সৃজনশীল প্রশ্ন

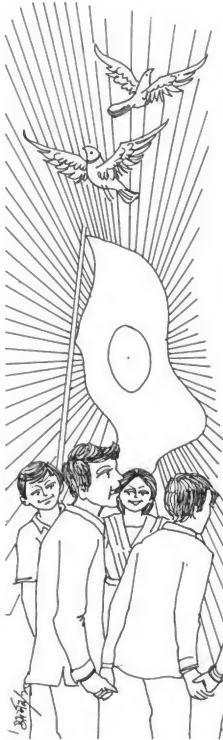
মা দিবসে রত্নগর্তী স্বীকৃত মারেসের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সাহেদা বেগমের বড় ছেলে সাজিদ অনুকৃতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন — আমাদের মা পৃথিবীর স্রেষ্ঠ মা। আমরা পিঠাপিঠি পাঁচ ভাই-বোন যখন খুব ছোট, তখনই বাবাকে হারালাম। মাকে কখনো ভেঙে পড়তে দেখিনি। দুঃখ-সাহিত্য-অভাব আমাদের নিত্য সঙ্গী ছিল। মা সব সময় আমাদেরকে খুশি রেখে, পড়াশুনা শিখিয়ে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলেছেন। তোমাকে শত শালাম ‘মা’। তোমার সুখের হাসির জন্য আমরা যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে প্রস্তুত।

ক. সন্ধ্যা দুপুর মার পায়ে কী বাজে?

খ. ‘রক্তে ধোওয়া সরেজিনী’ — বলতে কি বোঝানো হয়েছে?

গ. সাজিদের মাধ্যমে ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার কোন বিশেষ দিকটি হুটিয়ে তোলা হয়েছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. “শেফালি টিল্ল হলো উদ্দীপক ও ‘গরবিনী মা-জননী’ কবিতার বক্তব্য একই ধারায় প্রবাহিত” — বিশ্লেষণ কর।



## সাম্য সুফিয়া কামাল

শতকের সাথে শতক হতে  
 মিলারে একত্রিত  
 সব দেশে সব কালে কালে সবে  
 হয়েছে সমুন্নত।  
 বিপুল পৃথিবী, প্রসারিত পথ,  
 যাত্রীরা সেই পথে,  
 চলে কর্মের আহ্বানে কোন  
 অনন্ত কাল হতে  
 মানব জীবন। শ্রেষ্ঠ, কঠোর  
 কর্মে সে মহীয়ান,  
 সংগ্রামে আর সাহসে প্রজ্ঞা  
 আপোকে দীক্ষিমান।  
 পায়ের তলার মাটিতে, আকাশে,  
 সমুখে, পিছু জলে  
 বিজয় কেতন উড়ারে মানুষ  
 চলিয়াছে দলে দলে।

(সংক্ষেপিত)

### শদার্থ ও টীকা

শতক	—	একশত।
সমুদ্রত	—	অতিশয় উঁচু।
বিপুল	—	বিশাল।
প্রসারিত	—	বিস্তার লাভ করেছে এমন।
অনন্ত	—	যার অন্ত বা শেষ নেই।
মহীয়ান	—	সুমহান।
সঙ্গ্রাম	—	লড়াই।
প্রজা	—	পতীর জ্ঞান।
দীপ্তিমান	—	উজ্জ্বল।
সিদ্ধ	—	সমুদ্র, সাগর।
কেতন	—	পতাকা।

### পাঠের উদ্দেশ্য

ধর্ম-বর্ণ-গোত্র-শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্প্রীতি ও সহমর্মিতার বোধ সৃষ্টি করা।

### পাঠ-পরিচিতি

‘সাম্য’ কবিতাটি ‘নওল কিশোরের দরবারে’ গ্রন্থভুক্ত ‘মিলিত সেবা ও সাম্য প্রীতিতে’ কবিতার অংশবিশেষ। কোন বড় কাজ কেউ একা করতে পারে না। সে জন্য দরকার হয় অনেক মানুষের মিলিত অংশগ্রহণ। সকলকে নিয়ে কাজ করার মাধ্যমে পৃথিবীর বহু সেশ উন্নত হয়েছে। পৃথিবীর অনেক মহৎ কাজের পেছনেই ছিল মানুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা। অসীম সাহস, সম্মিলিত সাধনা ও সঙ্গ্রামের মধ্য দিয়েই মানুষ এই পৃথিবীতে তার বিজয় ঘোষণা করেছে। এ জন্য ধর্ম, বর্ণ, গোত্র – শ্রেণি ভেদে সকল মানুষের মধ্যে সম্প্রীতি ও সৌহার্যের পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।

### কবি-পরিচিতি

সুকিরা কামাল ১৯১১ সালে বরিশালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ছিলেন একজন সফল সংগঠক ও নারীনেত্রী। তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছেন এবং সকল আন্দোলন-সঙ্গ্রামে নারীদের অংশগ্রহণ করার জন্য উত্থুদ্ধ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে নারীজাগরণ বিশেষ করে নারীদের সম-অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। সাম্প্রদায়িকতা ও মৌলবাদের বিপক্ষে তিনি সব সময় সোচ্চার ছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ — ‘সাঁঝের মায়া’, ‘মায়া কাজল’, ‘কেয়ার কাঁটা’। তিনি ১৯৯৯ সালে মৃত্যুবরণ করেন।

### কর্ম-অনুলীলন

- অসাম্প্রদায়িক চেতনাসম্পন্ন সঙ্গীতানুষ্ঠানের আয়োজন কর। (দলীয় কাজ)
- সম্প্রদায়গত সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে কী কী উদ্যোগ গ্রহণ করা যেতে পারে – তার পরিকল্পনা গ্রন্থত কর। (একক কাজ)

## নমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. কর্ণের আহ্বানে মানুষ কত দিন হতে চলছে ?  
ক. সহস্রাব্দকাল      খ. অনন্তকাল  
গ. শতাব্দীকাল      ঘ. ঐতিহাসিক কাল
২. কালে কালে মানুষ কীভাবে সমুন্নত হয়েছে ?  
ক. সম্মিলিত প্রয়াসে      খ. একক প্রয়াসে  
গ. সভ্যতার বিকাশে      ঘ. অর্থনৈতিক বিকাশে

উদ্ধৃতাংশটি পড়ে ও ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) একতাই বল
- (২) চেষ্টায় সুসিদ্ধ করে জীবনের আশা

৩. উদ্ধৃতির ১ম অংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন চরণসমূহের মিল আছে ?  
i. বিপুল পৃথিবী, প্রসারিত পথ / যাত্রীরা সেই পথে  
ii. শতকের সাথে শতক হস্ত / মিলায়ে একত্রিত  
iii. বিজয় কেতন উড়ায়ে মানুষ / চলিয়াছে দলে দলে

কোনটি সঠিক ?

- |             |                |
|-------------|----------------|
| ক. i ও ii   | খ. i ও iii     |
| গ. ii ও iii | ঘ. i, ii ও iii |

৪. উদ্ধৃতাংশের সাথে ‘সাম্য’ কবিতার কোন ভাবের মিল আছে।

- |                     |              |
|---------------------|--------------|
| ক. সম্ভ্রাম         | খ. প্রচেষ্টা |
| গ. সম্মিলিত অবস্থান | ঘ. সাহস      |

## সৃজনশীল প্রশ্ন

১. অমিত সাহেব একটি পাঠাগার স্থাপনের জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। কিন্তু তাঁর একার পক্ষে এত বিশাল কাজ সম্পাদন কোনভাবেই সম্ভব হচ্ছে না। তিনি কারো সহযোগিতা নিতে সক্ষম নন। পরে গ্রামের সকল শ্রেণির মানুষের সার্বিক সহযোগিতায় পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়। এখন সবাই পাঠাগার থেকে বই সংগ্রহ করে গ্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করতে পারছে।  
ক. ‘সাম্য’ কবিতায় কোনটির মাধ্যমে জীবন মহীয়ান হয়?  
খ. ‘সম্ভ্রামে সাহসে প্রজ্ঞা’ দ্বারা কী বোঝানো হয়েছে?  
গ. অমিত সাহেবের চরিত্রে ‘সাম্য’ কবিতার বৈসাদৃশ্যের দিকটি ব্যাখ্যা কর।  
ঘ. “উদীপকের মূলভাব যেন ‘সাম্য’ কবিতারই প্রতিরূপ”— বিশ্লেষণ কর।

## মেলা

### আহসান হাবীব

ফুলের মেলা পাখির মেলা  
আকাশ জুড়ে তারার মেলা  
রোজ সকালে রঙের মেলা  
সাত সাগরে ডেউরের মেলা ।  
আর এক মেলা জগৎ জুড়ে  
তাইরা মিলে বোনরা মিলে  
মৎ কুড়িরে বেড়ায় তারা  
নীল আকাশেরে অপার নীলে  
ফুলের বুক সুবাস যত  
বুকে-মুখে সের মেখে তাই  
পাখির কলকল থেকে  
সুর তুলে নেয় তারা সবাই ।  
রাতের পথে পাড়ি যখন,  
তারার অবাক লীপ ছেলে নেয়  
রোজ সকালের আকাশপথে  
আলোর পাখি সের ছেড়ে সের  
সাত সাগরের বুক থেকে সের  
চেউ তুলে সের ভালোবাসার ।  
জগৎ জুড়ে যায় হুড়িয়ে  
যায় হুড়িয়ে আলো আশার ।  
ভালোবাসার এই যে মেলা  
এই যে মেলা তাই-এর বোনের,  
এই যে হাসি এই যে বুনি  
এই যে প্রীতি লক্ষ মনের -  
কচি সবুজ তাই-বোনদের  
আপনি পড়া এই যে মেলা,  
এই মেলাতে শিত্য চলে  
আপন মনে একটি খেলা ।  
সারা বেলাই সেই এক খেলা  
গড়বে নতুন একটি বাগান,  
অনেক ফুল আর অনেক পাখি  
সব পাখিদের আলোদা পান -  
তার মাঝেই একটি সুরে  
সবারই সুর যায় মিলিয়ে  
এক দুনিয়া এক মানুষের  
বল্লু তারা যায় মিলিয়ে ।



### সমার্থ ও টীকা

- মেলা - মিলন বা একত্র হওয়া। উৎসব বা অনুষ্ঠান উপলক্ষে অনেক মানুষের সমাবেশ। যেমন বৈশাখি মেলা; এরকম বই মেলা, কৃষি মেলা, বিজ্ঞান মেলা ইত্যাদি।
- ‘আর এক মেলা’
- জগৎজুড়ে’ - পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের মিলনের বা একতার উৎসবকে কবি অন্য এক রকমের মেলা বলেছেন।
- সুবাস - সুগন্ধ।
- নিত্য - রোজ।
- ‘তার মাঝেই একটা সুরে ..... বিলিয়ে’ - ভৌগোলিক সামাজিক-সাংস্কৃতিক কারণে মানুষেরা আলাদা আলাদা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হলেও মনুষ্যত্বের দিক থেকে সকল মানুষ এক। সেই এক মিলনের সুরে সবারাই সুর মিশে যায়।

### পাঠের উদ্দেশ্য

শিকারীদের মধ্যে নারী-পুরুষের সমতার চেতনা জন্মিত করা।

### পাঠ-পরিচিতি

পৃথিবীর চারদিকে যদি আমরা দৃষ্টি দিই তবে দেখতে পাই বাগানে ফুলের মেলা, গাছে গাছে পাখির মেলা আর আকাশে তারার মেলা। এ হলো প্রকৃতির জগৎ। অন্যদিকে পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের রয়েছে একটা আলাদা জগৎ। আর এটিও একটি মেলার মত। আকাশের নীলের মধ্যে যে উদারতা রয়েছে, ফুলের মধ্যে যে পবিত্র সুবাস রয়েছে, পাখির গানের মধ্যে যে সুর রয়েছে সবই পেয়েছে শিশু-কিশোররা। প্রতিদিন আকাশ নিড়ে যে রোদ গুঠে, সেখান থেকে তারা নেয় জীবনের উত্তাপ, সাত-সাগরের বুক থেকে তারা নেয় ভালোবাসার ডেউ। তাই তারা বিশ্ব জুড়ে ছড়িয়ে দেয় নবীন প্রাণের আশার আলো। কচি সবুজ ভাইবোনদের হাসি-খুশির মধ্যে লক্ষ লক্ষ সবুজ মনের স্নেহ-প্রীতির প্রকাশ ঘটেছে, দেশ-কালের সীমানা ভেঙে তারা অন্তরের ভালোবাসা দিয়ে গড়তে চাচ্ছে একটা সুন্দর জগৎ, সাজানো বাগানের মতো সুন্দর পৃথিবী। এ পৃথিবী হবে সকল মানুষের জন্য একটা অভিন্ন পৃথিবী।

পৃথিবীর সকল শিশু-কিশোরের ভাষা এক নয়। তবুও সব পাখির গানের মধ্যে যেমন একটা সুরের ঐক্য আছে, তেমনি পৃথিবীর শিশু-কিশোরদের মনের ভাষার মধ্যেও একটা মিল আছে। পৃথিবীর সব মানুষ একতাবদ্ধ হয়ে স্নেহ-ভালোবাসা পূর্ণ একটা সমাজ যদি গড়ে তোলে, তবে এ পৃথিবীর মধ্যে আর কোনো বিবাদ থাকবে না। তখন পৃথিবী হবে একটা দেশ, মানবসমাজ হবে একটা পরিবার। তখন কত সুন্দর হবে এ পৃথিবী।

### লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের বিখ্যাত কবি আহসান হাবীব। তিনি ১৯১৭ খ্রিষ্টাব্দে পিরোজপুর জেলার জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পেশায় ছিলেন সাবাদিক। তাঁর উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে: ‘রাশিদেশ’, ‘হারাছরিখ’, ‘সারাদুপুর’, ‘আশায় বসতি’ ইত্যাদি। তাঁর লেখা শিশুতোষ গ্রন্থগুলো বেশ জনপ্রিয়। ১৯৮৫ খ্রিষ্টাব্দে কবি আহসান হাবীব ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন।



### সুজনশীল প্রশ্ন

২। স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উদযাপন অনুষ্ঠানে বাংলা শিক্ষক বললেন, '৭১ সালে দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধের পর আমরা পেয়েছি এই মুক্ত আকাশ-বাতাস, পেয়েছি ছায়া সুনিবিড়-শান্তির নীড়, এই বাংলাদেশ। গ্রন্থান শিক্ষক বললেন, 'তোমরা আজকের শিশু-কিশোররা আগামী দিনের স্বপ্ন। শুধু দেশ ও জাতির জন্য নয়, শিশুরা সারা বিশ্বের সম্ভাবনা।'

ক. নীল আকাশে রং কুড়িয়ে বেড়ায় কারা?

খ. কবি আহসান হাবীব 'আলোর পাখি' বলতে কী বুঝিয়েছেন?

গ. বাংলা শিক্ষকের বক্তব্যে 'মেলা' কবিতার কোন দিকটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. "গ্রন্থান শিক্ষকের মঞ্চব্যে 'মেলা' কবিতার মূল বক্তব্যই ফুটে উঠেছে"— বিশ্লেষণ কর।





### শূদ্রার্থ ও টীকা

অক্ষর	- অক্ষর বলতে এখানে বর্ণ এবং বৃহৎ অর্থে মাতৃভাষা বোঝানো হয়েছে।
নির্ভর	- স্বরনা।
'এই অক্ষর যেন	- আমরা আমাদের মাতৃভাষায় কথা বলি, লিখি। আমাদের পূর্বপুরুষেরাও তাই করতেন।
নির্ভর ছুটে চলে অবিরাম'	- তাই বলা হয়েছে মাতৃভাষা অবিরাম ছুটে চলেছে। মানে মাতৃভাষার মাধ্যমে আমরা নানা কাজ করে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে চলেছি।
'যেন কিছু তারা	- এক সময়ে আমাদের এই দেশ পরাধীন ছিল। শালকেরা রত্নভাষা হিসেবে বাংলা ভাষাকে ব্যবহার করার সুযোগ থেকে আমাদের বঞ্চিত করেছিল। কিন্তু তখনকার
দিয়ে পাহারা আকাশেতে	- সচেতন বাঙালিরা এ অধিকার আদায় করে নেন। সে অধিকার আদায় করার জন্য
লিখে নাম'	- অক্ষরগুলো যেন নিরবচ্ছিন্নভাবে অনুপ্রেরণার বিষয় হয়ে আছে।
'এই অক্ষরে মাকে	- মায়ের কাছ থেকেই আমরা মাতৃভাষা প্রথম শিখি। তাই অক্ষর বা ভাষার দৃষ্টান্ত
মনে পড়ে'	- দেখলেই মাকে মনে পড়ে যায়।
উপমা	- তুলনা।
অপবৃণ	- খুব সুন্দর।
নুপুর	- পায়ে পড়ার অলংকার।
বৃণকথা	- রাজা-বাদশা, রাজপুত্র-রাজকন্যা, দৈত্য-দানো, রাক্ষস-খোঙ্কস প্রভৃতি কাহিনি নিয়ে
	- কাহিনিক পল্পকে বলে বৃণকথা।
শিলালিপি	- পাথরে খোদাই করা লেখা, অনেক দিন স্থায়ী করে রাখার জন্য লেখা পাথরে বা
	- তামার পাতে লিখে রাখা হতো। এরকম পাথরের ওপর লেখাকে বা ঐ পাথরের
	- খণ্ডটিকে বলা হয় শিলালিপি।
'এই ভাষা দিয়ে	- এ কথাটি খুবই ভাব্যপূর্ণ। মাতৃভাষার মাধ্যমেই বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামীদের
গান লিখে নিয়ে	- উদ্ধৃত করা হয়েছে। তাই কবি বলেছেন যে এই ভাষা দিয়ে আমরা লিখেছি মুক্তির
যুদ্ধ করেছে জয়'	- গান। আর সেই গান মুক্তিযোদ্ধাদের উৎসাহ জুগিয়েছে। সুতরাং মাতৃভাষা ও
	- মাতৃভাষার জন্য আন্দোলন থেকে আমরা পেয়েছি স্বাধীনতার অনুপ্রেরণা।

### পাঠের উদ্দেশ্য

মাতৃভাষার প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধা ও মমত্ববোধ জাগ্রত করা।

### পাঠ-পরিচিতি

বাংলা অক্ষর বা বর্ণ বাঙালি জাতির অনন্য সম্পদ। এই বর্ণমালা বাঙালির গ্রাণের সঙ্গে অস্তিত্বের সঙ্গে মিশে আছে। বাংলা অক্ষর বাঙালির চিন্তকে আনন্দে ভরে দেয়। বাঙালিকে করে তোলে স্বল্পমুখী। বাংলা অক্ষর বাঙালির চোখে দেখা দেয় মায়ের বুণ ধরে। কখনো তার চিন্তে বাজায় সুরের নুপুর।

বাংলা অক্ষর বাঙালির মিলিত সত্তার শ্রেষ্ঠতম উৎস। আমাদের অক্ষরসমূহ আপন-পর সকলকে কাছে টানে, দূর করে দেয় সব বিতেন। বাংলা অক্ষর বাঙালির বুকে সঞ্চার করে অব্যবহিত আশা। আলোচ্য কবিতাটিতে বাংলা অক্ষর তথা বর্ণমালার প্রতি কবির অব্যবহিত ভালোবাসা ও গভীর শ্রদ্ধা প্রকাশ পেয়েছে।

### লেখক-পরিচিতি

বাংলাদেশের উল্লেখযোগ্য কবি মহাসেন সাহা। তিনি ১৯৪৪ খ্রিষ্টাব্দে সিরাজগঞ্জ জন্মগ্রহণ করেন। মহাসেন সাহার উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো: 'এই গৃহ এই সন্ন্যাস', 'অন্তিমিত কালের পৌরব', 'টাপুর টুপুর মেঘের দুপুর', 'ছবি আঁকা পাখির পাখা', 'সরবে ফুলের নদী' ইত্যাদি।

## কর্ম-অনুশীলন

- ক. তোমার পূর্বে পড়া বাংলা ভাষা বিষয়ক একটি গল্প বা কবিতা অবলম্বনে একটি রচনা তৈরি কর (একক কাজ)।  
 খ. ভাষা-আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতাসমূহ সংগ্রহ করে একটি দেয়ালিকা প্রকাশ কর (দলীয় কাজ)।

## নমুনা প্রশ্ন

## বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. এই অক্ষরে কবিতার কাকে মনে পড়ায় কথা বলা হয়েছে ?  
 ক. শ্রিয়জনকে                      খ. মাকে  
 গ. দেশকে                          ঘ. ভাষাকে
২. 'এই অক্ষরে যেন নির্ঝর / ছুটে চলে অবিরাম' - চরণদ্বয় দ্বারা কবি বুঝিয়েছেন -  
 i. মাতৃভাষায় আমরা অতীত ইতিহাস জানি  
 ii. বর্তমানকে আমরা মাতৃভাষায় বুঝতে পারি  
 iii. আমরা ভবিষ্যতের স্বপ্নও বুনি মাতৃভাষায়

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i                                      খ. ii  
 গ. ii ও iii                          ঘ. i, ii ও iii

কবিতাংশটি পড়ে ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

- (১) বাংলার গল্প বাংলার গীত  
 তনিলে এ চিত্ত সদা বিমোহিত
- (২) সুখে দুঃখে তারা এসে মোর পাশে  
 তোষে সদা মোরে মধুর সম্বোধে
৩. ১ নং পঙ্কতিদ্বয়ে 'এই অক্ষরে' কবিতার কোন দিকটির প্রকাশ পেয়েছে ?  
 ক. ভাষাশ্রীতি                      খ. প্রকৃতিশ্রীতি  
 গ. মর্যাদাশ্রীতি                  ঘ. স্বদেশশ্রীতি
৪. ২ নং পঙ্কতিদ্বয়ের বক্তব্যে নিচের কোন চরণ/চরণসমূহে প্রকাশ পেয়েছে ?  
 i. এই অক্ষরে / ডাকনাম ধরে / ডাক দেয় বুঝি কেউ  
 ii. এই অক্ষর / আত্মীয়-পর / সকলেরে কাছে টানে  
 iii. এই অক্ষরে / মাকে মনে গড়ে / মনে হয়ে যায় নদী

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii                              খ. i ও iii  
 গ. ii ও iii                          ঘ. i, ii ও iii

### সুজনশীল প্রশ্ন

১. আর তাই তো কখনো আমি পড়তে দিই নি খুলো এই কালো  
এ-কারে আ-কারে  
তারো যেন ক্ষেতের সোনালি পাকা ধান, থোকা থোকা  
পড়ে থাকে জুই।  
তোমার জন্য জয় করেছে একটি মুহূর্ত  
একটি দেশের স্বাধীনতা।
- ক. কঠিন পাথরে কী লেখা হয়?
- খ. 'এই অক্ষরে – মাকে মনে পড়ে' বলতে কবি কী বুঝিয়েছেন? – ব্যাখ্যা কর।
- গ. উদীপকের 'তারো'–'এই অক্ষরে' কবিতার কিসের সাথে তুলনীয়? ব্যাখ্যা কর।
- ঘ. উদীপকের শেষ দুটি চরণে 'এই অক্ষরে' কবিতার সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবার্থ ফুটে উঠেছে। – উক্তিটির যথার্থতা নিরূপণ কর।